স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির পর্ব-৫ আজ রবিবার, এপ্রিল ৩, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৫ম পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-৩২-

আনিসের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরের আলো এসে ঘর আলোকিত করেছে। এখন একটা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। সকালের আলো ঘরে প্রবেশ করলেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর প্রাত:ক্রিয়া সেরে, গোসল করে কিছু মুখে দিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। বিছানা ছেড়ে উঠতেই চোখ গেল দেয়াল ঘড়ির দিকে। রাত বাজে দুটা! ঘড়ির ব্যাটারি শেষ? না, ঘড়ি তো ঠিকই চলছে। তাহলে এ আলো কিসের? জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সবকিছুই আলোকিত হয়ে আছে। জানালার কাছে গিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে সে থ হয়ে গেল! এখানে প্রায় প্রতি পাড়াতেই ছোট হোক বড় হোক একটা পার্ক থাকে। কয়েকটা ব্লক পর পর। এসব পার্কে বাচ্চাদের খেলনা থাকে, বসার চেয়ার থাকে। আমানের বাসার পেছনেও এমন একটা পার্ক আছে। কোন দিন সে পার্কে গিয়ে বসেনি। যখনই জানালা দিয়ে তাকিয়েছে দেখেছে কিছু মানুষ আছে। বসে গল্প করছে। এরা নাকি রিটায়ার্ড। সরকারের ভাতা পায়, শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। সামারে সারাদিনই পার্কে বা বাজারে ঘুরে বেড়ায়। কথা বলার মানুষ পেলে এরা ছাড়তে চায় না। একটার পর একটা বলতে থাকে। উইন্টার শুরু হবার সাথে সাথে যখন তখন কাউকে বসে থাকতে দেখা যায় না। মাঠে এখন কোন জনমানব নেই। এখন কোন গাছেই পাতা নেই। দু একটা ক্রিস্টমাস ট্রি ছাড়া। কখন যে হঠাৎ করে গাছের সব পাতা ঝরে গেল খেয়াল করেনি। তার আগে কিছু দিন ছিল রঙের খেলা। এদেশে গাছের পাতা হঠাৎ করে ফুল হয়ে যায়। কত রং বেরঙের ফুল! একই গাছে কত রঙের পাতা! একই পাতায় কত রঙ! আমানের

সাথে একদিন সেন্ট্রাল পার্কে গিয়েছিল। শীত শুরু হবার আগে সে□ স্বরের শেষের দিকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিল আনিস। প্রকৃতির কি রূপ! গাছের পাতার কি রূপ। এখন পাতা ঝরার বেলা। কিছু পাতা গাছের নীচে ঝড়ে পড়ে ফুল হয়ে বিছিয়ে আছে। এর উপর দিয়ে হাটতে মনে লাগে। এমন সুন্দর পাতাগুলো পায়ে মাড়িয়ে যাবে! গাছের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারে না। প্রতিটি গাছের পাতার আলাদা রং। বেশিরভাগ হলুদ আর লাল-নীল,খয়েরী মেশানো। কি অদ্ভুত সে দৃশ্য। সব পাতা এখন ফুল হয়ে আছে। যেন শিল্পী তার তুলিতে রঙের খেলা খেলেছে। এ দৃশ্য চোখে না দেখলে অনুভব করা যায় না। যেন স্বপ্নের দেশে কাটিয়ে এল এই চার পাঁচ ঘন্টা। সেই পাতা দু সপ্তাহের মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে আনিস। সমস্ত মাঠ, মাঠের পত্রবিহীন ডালা, পথ ঘাট সবকিছু ঢেকে আছে। যেন শেফালী ফুল দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে সাজিয়েছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! একি বরফ! বরফ পৃথিবীকে এমনি করে সাজায়! বরফের এমন রূপ! এযে শিল্পীর আঁকা একটা ছবি! গাছের প্রতিটি ডালার উপরের দিকে বরফ জমে আছে। এখন ডালাগুলোকে দেখায় যেন শিল্পী দু রকম রং ব্যবহার করেছে। উপরের দিকটা নীল-সাদা, নীচের দিকটা খয়েরী। সামনে বাড়ীগুলোর দিকে চোখ গেল। প্রতিটি বাড়ীর ছাদ সাদা। জানালার কার্নিশ, বাড়ীর দরজা, রাস্তায় পার্ক করা গাড়ীগুলোতে তুলির আঁচড়। পেজা তুলার মত লক্ষকোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা অবিরাম ঝরছে। নি:শব্দে, নীরবে। শ্বেত-শুভ্র কণা। কোথায়ও এক ফোঁটা হাওয়া নেই। আকাশে চাঁদ নেই। প্রকৃতি আজ আকাশটা খুলে দিয়েছে যেন! আকাশের সব তুষার ঝড়ে পড়ছে। দূরে একটা লাইট পোষ্টের আলোতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ তুষারের খেলা। যেন আলোর চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হয় ছোট ছোট প্রাণী লাইটপোষ্টের আলোতে খেলা করছে।

আকাশে চাঁদ না থাকলেও আকাশের একটা আলো আছে। সেই আলো বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে চারদিকে আলোকিত করে। সেই আলোতে মনে হয় বুঝি সকাল হয়ে গেল। আনিস ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই চাঁদের সন্ধান করছে। নেই। চাঁদ তখন অন্য দেশে।

এমন একটা মনমাতানো দৃশ্য আনিস একা ভোগ করে আরাম পাচ্ছে না। আমানকে ডাক দিল। আমান, উঠ! চেয়ে দেখ কি অপূর্ব দৃশ্য! বরফের খেলা দেখ।

আমান জেগে গেল। বিছানা থেকে না উঠেই বলল, তুইই দেখ। এখন তোর কাছে ভাল লাগবে। এসব দেখে একবারে বিরক্ত হয়ে গেছি। এই বরফের মাঝে ডেলিভারী দিতে কি যে কষ্ট তুই যদি বুঝতে পারতি। আমার এত রস নাই।

কাল সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরি তখনও তো বরফ পড়ে নাই। এত সব কখন পড়ল আর পথঘাট সব ঢেকে ফেলল? এভাবে পড়তে থাকলে সকালে তো গাড়ী ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ চলাফেরা করবে কি করে?

ওটা তোমার চিন্তা নয়। মিউনিসিপ্যালিটির চিন্তা। এদের গাড়ী দিন রাত কাজ করে। বরফ গলার জন্য এক রকম লবণ আছে। গাড়ীতে করে রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়। বরফ তখন পানি হয়ে যায়। তবে ফুটপাথের ব্যাপারটা আলাদা। কোন কোন জায়গায় ছোট এক প্রকার গাড়ী আছে, তাকে বলে স্নো রিমোভার, তা দিয়ে পরিষ্কার করে। যেখানে বাড়ীঘর বা দোকানপাট আছে সেখানে অন্য কথা। যার যার বাড়ীর সামনে বরফ

পরিষ্কার করা তার তার দায়িত্ব। দায়িত্ব পালন না করলে বিপদ আছে। সে বিপদ মহা বিপদ বলতে পার।

কি রকম?

যদি কেউ পিছলে পড়ে যায় আর মামলা করে তাহলে জরিমানা পঞ্চাশ হাজার ও হতে পারে আবার পঞ্চাশ লাখ ও হতে পারে। নির্ভর করে উকিলের উপর। পত্রিকায় দেখবে কিছু উকিল বিজ্ঞাপন দেয়, এক্সিডেন্ট? নো ফি। আমরা সব করব। মামলা জিতলে পয়সা। আসলে এই উকিলগুলোর কাজই হল সোজা ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে মাছ শিকার করা। পেয়েও যায় কম বেশী। কোন রকমে তুমি কোন দোকানের সামনে বা বাড়ীর সামনে একবার পিছলে পড়লেই হল। তোমার কপাল খুলে গেল। উকিলকে কল দাও। সাথে সাথে তারা তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, যত রকম পরীক্ষা সব করাবে। তারপর তোমার দেহের অনেকগুলো অংশ বিকল হয়ে গেছে বলে দাবী করবে। খেলা চলবে, ডাক্তার, উকিল আর থেরাপিষ্ট মিলে। তোমার হাতে কিছু টাকা আসবেই।

এক বাঙালী বাড়ীর মালিকের বিরুদ্ধে আর এক বাঙালী মামলা করে বেশ টাকা পেয়েছে। অবশ্য বাড়ীর মালিকের নিজের পকেট থেকে দিতে হয়নি। তার বাড়ীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দিয়েছে। বাড়ী মেরামত করতে গিয়েছিল এক ভাসমান কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী। তার আবার লাইসেন্স আছে। সেই লাইসেন্সের জোরে মামলা করে জিতে গেছে। এই বরফের সুন্দর দিকটা দেখলেই চলবে না। বিপদের দিকটাও দেখতে হবে। আর একটা কথা মনে রেখ। তুমি কিন্তু একবার প্রস্রাব লাল বলে বিপদে পড়েছিলে। এখানে বরফ বলতে কিন্তু আমরা যা বুঝি তা নয়। বরফের সব মানেগুলো বুঝে নাও। এখন যা পড়ছে তা কিন্তু বরফ নয়। বাংলায় একে তুষার বলতে পার। ইংরেজীতে যাকে বলে স্নো।

তাহলে বরফ কোনটা?

ইংরেজিতে যাকে বলে আইস, বাংলায় বরফ। এই তুষার কয়েকদিন থাকার পর পরিস্কার না করলে দেখবে পাথরের মত শক্ত হয়ে যাবে। সেটা হল আইস মানে বরফ। তুষারের মাঝেও আবার প্রকারভেদ আছে। একটা আছে স্নো ফ্লেইক। দেখবে পাতলা পাখীর পালকের মত। পড়ার সাথে সাথেই গলে যাবে। মাথায় পড়লে চুল ভিজে যাবে। ফ্লেইক জমেনা যেমন স্নো জমে। স্নো সাথে সাথে গলেনা। স্নো মাথায় পড়লে পিছলে পড়ে যায়, গায়ে লেগে গলে যায় না। আর এক প্রকার আছে স্নো স্লিট। বৃষ্টির সাথে পাতলা স্নোর পাত। তুষার বৃষ্টি মিলে শরীর একবারে ভিজিয়ে দেয়। পথ সাথে সাথে পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। সময়ে সবই দেখবে। আরও আছে স্নো ড্রিফট যা এত হালকা যে বাতাসেই ভাসে, ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে। বাতাস বন্ধ হলেই নীচে পড়ে। স্নো ষ্টর্ম মানে তুষারঝড় অনেক সময় বিপদজনক। কোন কোন সময় স্নো নয়, ছোট ছোট বরফের কণা বাতাসের বেগে উড়ে চলে। গায়ে লাগলে আঘাত করে। আঘাত কত বড় তা নির্ভর করে বরফের কণা কত বড় এবং ঝড়ের বেগ কত, তার উপর। তবে আমাদের দেশের মত এখানে শীলাবৃষ্টি হয়না যেমন বড় বড় শীল পড়ে জমির ফসল নষ্ট করে ফেলে। যা, এবার ঘুমাতে যা।

সকাল আটটায় ঘর থেকে বের হল আনিস। সাবওয়ের দিকে হাটছে, বামদিকে ছোট মাঠের মত একটু ফাকা জায়গা। সেই ফাকা জায়গায় সাদা কালো অনেকগুলো ছেলেমেয়ে একজন আর একজনকে ঢিল মারছে। বরফ দিয়ে বল বানিয়ে। ইচ্ছে করে তারা বরফের উপর গড়িয়ে

পড়ছে। কুস্তি খেলছে, একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে। পথচারীর দিকে স্নো বল ছুড়ে মারছে। এই একটা জিনিষই আছে যা মারলে কেউ রাগ করে না। স্নো বল। যে কেউ যাকে ইচ্ছে মারে। এ এক আনন্দ। যেন একটা উৎসব শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় গাড়ী ঠিক চলছে। কোন স্নো নেই। মাঠের কোনে এক মহিলা আপাদমস্তক শীত বস্ত্রে আবৃত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা স্কুল ব্যাগ। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছে। আনিস আরও কাছে এগিয়ে যেতেই কানে বাজল বাংলা শব্দ। তাড়াতাড়ি আয় বাবা, স্কুল শুরু হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে ছেলে বলছে, ফাইভ মিনিটস মওর, মাম!

আমার তো আবার কাজে যেতে হবে বাবা!

কামিং মাম! বলে একটা ছেলের সাথে কুস্তি লেগে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

আনিস মা ও ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল তার পথে। মনে মনে বলল, এগিয়ে যাও বাঙালীর নতুন প্রজন্ম। স্রোতের সাথে এমনি করে মিশে যাও।

-৩৩-

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে জ্যোতি প্রকাশ দত্ত আহ্বায়ক হিসাবে আয়োজন করলেন প্রথম সাহিত্য সমাবেশ। স্থান রকফেলার ইউনিভার্সিটির কমিউনিটি সেন্টার। ইস্ট রিভারের তীরে মনোরম পরিবেশে, ৩৮তম তলায় অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে উত্তর আমেরিকার প্রায় সকল ষ্টেট থেকে কবি সাহিত্যিক যোগদান করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন বোষ্টন থেকে আগত স্বনির্বাসিত কবি শহীদ কাদরী। পরিচালনা করেন পূরবী বসু। এই সমাবেশের বক্তব্য ছিল, 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাহিত্য'। সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে আগত অনেক নবীন প্রবীন কবি সাহিত্যিক স্বরচিত লেখা পাঠ, প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ করেন। আলোচনা, সমালোচনায় মুখরিত হয়ে উঠে এই সমাবেশ। উন্মুক্ত এই সমাবেশে অনেক নতুন মুখ অংশ গ্রহন করেন।

বিন্দু প্রায় সব কটি আসরে উপস্থিত থাকে। নিজে কিছু লেখেনা, পাঠও করে না। কোন আলোচনায় অংশ নেয় না। কিন্তু উপভোগ করেন। এই অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে কিনে কোন খাবার আনা হয়নি। আসরের সদস্যরা একেকজন একেকটা আইটেম তৈরি করে নিয়ে এসেছে। বিন্দুর ভাগে পড়েছে মিষ্টি।

ইদানিং লতা নিজকে আর অসহায় মনে করে না। এতিম ভাবে না। যখনই সময় পায় বিন্দুর এখানে চলে আসে। তার রান্নাবান্নার কোন ঝামেলা নেই। যখন দরকার হয় তখন সৈয়দ সাহেবকে ফোনে বলে দেয়। সে হালাল খাবার নিয়ে আসে হালাল রেষ্টুরেন্ট থেকে। লতার ছেলে শান্ত আসলেই শান্ত। বিন্দুর ছেলেমেয়েদের সাথে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। বিন্দুর ছেলেমেয়েরাও তাকে খুব আদর করে। বিন্দুর এখানে যতক্ষন থাকে ততক্ষন শান্তর জন্য কোন চিন্তা থাকে না। প্রয়োজনে শান্তকে রেখে সে চলে যায় কেনা কাটা করতে। বিন্দুর কাছে আসলে তার মন খুব ভাল থাকে। কথা বলে আরাম পায়। যে সব বই পড়ে তা কেমন লাগল তা নিয়ে আলোচনা করে। আনিসের সময় থাকলে তার ওখানে যায় অথবা আনিস চলে আসে লতার বাসায়। বিন্দু লতাকে বলল, তুমি কেন এই সম্মেলনে কিছু একটা পাঠ কর না?

হ্যা, তাইতো! আমি একটা কবিতা পাঠ করব। কবিতা বাছাই করে ঠিক করল কবি গুরুর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা পাঠ করবে। বাসায় বসে কয়েক বার মহড়া দিল। আনিস বলল, আপনার সময় কাজে লাগানোর এই তো উপযুক্ত পথ। আপনি তো ইচ্ছে করলে লিখতেও পারেন। বলা বাহুল্য, লতা এখানে আসার এক বছর পর ইংরেজি কোর্সটা শেষ করেছে। প্রত্যেক এলাকায় কমিউনিটি শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। যাদের ইংরেজি মাতৃভাষা নয় তাদেরকে ইংরেজি শিক্ষা দেয়া হয়। বছর খানেক এই ইংরেজি নিয়ে কেটেছে। এখন শুরু হয়েছে বই পড়া আর গানের কেসেট যোগার করা। যখন তখন জ্যাকসন হাইটসে চলে যায়। পছন্দের কেসেট কিনে।

সেই অনুষ্ঠানে তার আবৃত্তি শোনে শ্রোতারা বাহাবা দিল। বিশেষ করে লতার কোকিল কণ্ঠে এই আবৃত্তি সকলকে আকৃষ্ট করল। জ্যোতি প্রকাশ দত্ত বললেন, এই মেয়েটা কে? খুব ভাল আবৃত্তি করে তো! লতাকে ডেকে বলল, এখন থেকে তোমাকে প্রতিটি আসরে আমরা দেখতে চাই।

আনিস পাঠ করেছে সুকান্তের কবিতা। বেশ হাত তালি পড়েছে। কিন্তু লতার মত সকলে আকৃষ্ট হয়নি। লতার উৎসাহ বেড়ে গেল। মনে হল হঠাৎ করে একটা আনন্দ জগতে পৌছে গেল। একটা জগতের দ্বার খোলে গেল।

সমাবেশ শেষে ঘোষনা করা হল আগামী এপ্রিলে ১৪০০ সালকে বরণ করা হবে। ১৪০০ সাল একবারই আসবে। আমরা ভাগ্যবান। আমাদের সামনে এ সুযোগটা এসেছে এবং আমরা তা বরণ করার সুযোগ পেয়েছি। প্রবাসী সকলেই আমন্ত্রিত।

১৪০০ সাল উদযাপনের দায়ীত্ব নেন বাহার। এষ্টোরিয়ার প্রেসবাইটারিয়ান চার্চে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৮ই এপ্রিল ১৯৯৩। ১৪০০ সালকে নিয়ে প্রবাসে ইতিহাস রচনা করতে হবে। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। ধরে রাখতে হবে জীবনের পাতায়। প্রবাসের ইতিহাসে। বাংলাদেশে বরণ করবে বিশাল আকারে। প্রবাসে এতসব সুযোগ না থাকলেও একটা বিশেষত্ব আনতে হবে। প্রমান করতে হবে আমরা প্রবাসীরাও কম যাই না। আমরা প্রবাসে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছি। আমরাও উপভোগ করছি বাংলাদেশের মানুষের মত বাঙালী সংস্কৃতি আর উৎসব। লোক সমাগম হয়ত কম হবে কিন্তু আনন্দ কম হবে না।

কাজ ভাগ করে দেয়া হয়েছে। বাহারেরর হাতে রেখেছে অতিথি নিমন্ত্রন, হল ভাড়া করা, পত্রিকার সাথে যোগাযোগ করা। আনিস তৈরি করবে অনুষ্ঠান সূচী। লতা লিষ্ট করবে অনুষ্ঠানে কে কি পড়বেন বা বলবেন। লিজি রহমান দেখবে গান বাজনার দিকটা। খাদ্য যোগান দেবে বিন্দু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন আনিস, তার সহযোগি থাকবে লতা, লিজি, মহসীন, আর কৌশিক আহাম্মদ। তাদের সাথে সহযোগি থাকবে কয়েক জন।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে ধরে রাখার জন্য প্রায় সকল ষ্টেট থেকে অতিথি আমন্ত্রিত হলেন। লন্ডন থেকে আমন্ত্রিত হলেন একুশে গানের রচয়িতা বিখ্যাত কলামিষ্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী এবং জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আনু মোহাম্মদ। স্থানীয় বুদ্ধিজীবি ও গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও কবি সাহিত্যিক। সকাল দশটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাত বারটা পর্যন্ত চলে। বাঙালি এই ১৪০০ সালের জন্য অপেক্ষায় ছিল। তার প্রমান মিলল যখন বাঙালীর উপছে পড়া ভীড় চার্চের উপর তলা নীচের

তলা মিলে ৫ হাজার সিট ভরে বাইরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য শেষ পর্যন্ত পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

এই বরণোৎসবে প্রধান বক্তব্য ছিল, 'নতুন শতাব্দীর জন্য সাহিত্য'। উদ্বোধন করেন বাহার। তারপর কৌশিক আহাম্মদের ভরাট কণ্ঠে কবি গুরুর ১৪০০ সাল কবিতা আবৃত্তি শুরু হয় -

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তোরা আজি পড়িছ বসি
আমার কবিতাখানি কৌতুহল ভরে..

তারপর একে একে আবৃত্তি করেন আনিস, লতা, লিজি রহমান, আফিফা, ফরিদা মজিদ, ফরিদা রহমান, এম এম মহসীন এবং আরও অনেক সামাজিক ব্যক্তিত্ব। নব বর্ষের উপর আবৃত্তি এবং আলোচনা ছাড়াও প্রবন্ধ, ছড়া, হাসির গল্প ইত্যাদি চলে সারাদিন। শেষ পর্বে নাচ গানের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি এবং বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টার। বাংলাদেশ কালচারাল সেন্টারের শিশু শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান মুখরিত হয়ে উঠে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি। সঙ্গীতে অংশ গ্রহন করেন আকরাম হোসেন, মাহমুদ হোসেন দুলু, দুলাল ভৌমিক, উমা খান, শাহরীন সুলতানা, স্বপ্না কায়সার ও পিনু খান। এই বিরাট পরিসরে অনুষ্ঠিত ১৪০০ সাল বরনোৎসবে বাহারকে যারা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেন তারা হলেন: ড: খন্দকার আলমগীর, ড: ওয়াদুদ ভূইয়া, ড: সলিল বর্মন, নরবার্ট মেন্ডেজ, মোর্শেদ আলম, ড: জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, ড: মুসতাক ইলাহি, ড: নুরুন নবী, ড: মিনা ফারাহ, জাহানারা আখতার, হাসান ফেরদৌস, তারিক মাহবুব, রতন তালুকদার, ফরিদা সরকার, শিকদার হুমায়ুন কবির, আজাদ রহমান, আব্দুল্লা ফিরোজ এবং আরও অনেকে।

প্রবাসে এমন পরিসরে ১৪০০ সালকে বরণ করে একটি উপমা রেখে দিল সাহিত্য পরিষদ।

-৩৪-

আমান বাংলাদেশ এ্যাম্বেসীতে যাবে। আনিসকে বলল, চল আনিস, বাংলাদেশ এ্যাম্বেসী থেকে আসি। আমার পাসপোর্ট রিনিউ করতে হবে। সকাল সকাল গেলে এ্যাম্বেসীর কাজ সেরে আমার কাজে চলে যাব।

কোথায় এ্যাম্বেসী?

ম্যানহাটানের ৪২ ষ্ট্রিটে।

আসলে এটা এ্যাম্বেসী নয়। কনসুলার জেনারেলের অফিস। সবাই বলে এ্যাম্বেসী। তাই এ্যাম্বেসী নামেই সকলের কাছে পরিচিত। আসল এ্যম্বেসী হল ওয়াশিংটনে। রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে যত রকম কাজকর্ম তা হয় ওয়াশিংটন অফিস থেকে। এখানে কনসুলার অফিস করা হয়েছে বাংলাদেশী নাগরিকের সেবা পাওয়ার সুবিধার্থে। বাংগালীর সিংহভাগ নিউইয়র্কে। ওয়াশিংটনে সামান্য কিছু বাঙালী আছে। তারা সেবা পায় ওয়াশিংটন অফিস থেকে। বলতে গেলে প্রধান সেবা অফিস এই ম্যানহাটানের অফিস। এই অফিসের কাজের এবং কর্মচারির পরিধি ওয়াশিংটন অফিসের চেয়ে অনেক বেশি। এর কর্ম পদ্ধতি এবং কর্মচারির দাপট অনেক বেশি। এই অফিসের আয় ব্যয় এবং কায়দা কানুন অনেক আলাদা। নিয়ম কানুন যখন তখন বদল হয়।

ওরা যখন কনসুলার অফিসে পৌঁছল তখন বেলা দশটা বেজে পনের মিনিট। কাউন্টার বন্ধ। একটা নোটিশ লেখা আছে, 'অফিসের সময় সূচী

– সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত।' কাউন্টারের কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় তিনজন কর্মচারি কফি খাচ্ছে আর হেসে হেসে কথা বলছে। তারও বেশ কিছুক্ষন পর কাউন্টারে একজন কর্মচারি এসে বসলেন। তখনও তার মুখে হাসির রেশ লেগে আছে। কিন্তু কাউন্টারে বসার সাথে সাথে তার মুখের ভাব বদলে গেল মুহূর্তে। তিনি খুব গম্ভীর মুখে আসন গ্রহন করলেন প্রবাসীর সেবা করার জন্য। মনে হল তিনি একজন বিচারক। আদলতে বসলেন। তার পদবী কি তা বলা মুস্কিল। কারণ এখানে সবাই এ্যাম্বাসেডর। কথা আছে প্রবাসে প্রতিটি বাংলাদেশি বাংলাদেশের একজন এ্যাম্বাসেডর। বাংলাদেশ থেকে যখন বিদেশের দূতাবাসে কর্মচারি পোষ্টিং দেয়া হয় তখন ফুল টিম পাঠানো হয়। তাতে বড় সাহেব থেকে ছোট সাহেব পর্যন্ত সব রকমের কর্মচারি অবশ্যই থাকে। তাদের সাথে একটা পদ থাকতেই হবে যা না হলে বড়সাহেব বা ছোট সাহেব কারও চলেনা। সেটা হল পিয়ন। পিয়ন ছাড়া অফিস চলেনা। এখানে কোন্ ব্যক্তি যে এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন তা বুঝা যায় না। মনে হয় সবাই এ্যাম্বাসেডর। তবে ব্যবহার দেখে মাঝে মাঝে বুঝা যায়। যিনি কাউন্টারে বসলেন তিনি বোধ হয় এ জাতীয় কিছু হবেন। বাইরে লাইনে যারা আছে তারা তার কাছে কীটজাতীয় পদার্থ। তাদের সেবা তিনি করছেন। দয়া করে।

আমান লাইনের তের নম্বর। প্রথম ব্যক্তির সাথে কাউন্টারের সাহেব কথা বলছেন। তিনি খুব কম কথা বলেন মনে হল। নতুন পাসপোর্টের দরখাস্ত। নতুন পাসপোর্ট পেতে হলে কি কি লাগে তা উল্লেখ করা আছে দরখাস্তের ফর্মে। সেই অনুপাতে আগের পাসপোর্টের ফটোকপিসহ দরখাস্ত প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছে। পোষাক দেখে মনে হয় বাংলাদেশের গন্ধ এখনও লেগে আছে গায়ে। সদ্য এসেছেন বোধ হয়।

কনসুলার অফিসের প্রত্যেকেই জানেন যে, ইমিগ্র্যান্ট ছাড়া আর সব বাঙালী এদেশে পদার্পন করার পরই তাদের প্রথম যে বস্তুটার প্রয়োজন তা হল একখানা নতুন পাসপোর্ট। আগের পাসপোর্ট এবং নাম বাতিল। নিজে নিজে বাতিল করলে চলবেনা। তার কিছু কাজকর্ম সমাধা করতে হবে। যেমন বলতে হবে আগের পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। তার প্রমাণ স্বরূপ পুলিশ ষ্টেশনে হারানোর রিপোর্ট করতে হবে এবং সে রিপোর্টের কপি জমা দিতে হবে। তার সাথে আগের পাসপোর্টের কপি। দুজন বাংলাদেশীর সাক্ষী যারা দরখাস্তকারিকে চিনে ইত্যাদি। নতুন পাসপোর্টে আগের নামই থাকবে সামান্য কিছু রদবদল হবে মাত্র। আর জন্মতারিখ। এটা বদল হবেই। এদেশে এই জন্মতারিখটা খুব দরকারি। নতুন পাসপোর্ট হয়ে গেলে পরবর্তি পদক্ষেপ কি হবে তা বলে দিবে ইমিগ্রেশন কনসাল্টেন্ট। বাংলাদেশে যেমন পানের দোকানেও এন্টিবাওটিক ঔষধ কিনতে পাওয়া যায় এবং দোকানদার বলে দেয় কতটুকু কয়বার খেতে হবে তেমনি এখানে প্রাথমিক পরামর্শ দেবার জন্য পরামর্শদাতার অভাব নেই। কি ভিসায় এসেছে, নামটা কিভাবে কতটুকু বদল করতে হবে, নাম বদল করতে হবে এই জন্য যে ইমিগ্রেশনে নাম ধাম রেকর্ড করা আছে কোন্ ভিসায় এসেছে, এখন অন্য কারণ দেখিয়ে দরখাস্ত করলে ধরা খেয়ে যাবে। তাই কোন কোন নাম সম্পুর্ন নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়, এখন পলিটিক্যাল মারবে নাকি পুরাতন কোন প্রগ্রামের অধিনে মারবে ইত্যাদি স্থির হয় যে বাসায় দরখাস্তকারি প্রথম এসে উঠলেন সে বাসার পরামর্শদাতার সাহায্যে। তারপর চলে খেলা। কেউ যায় ওয়াকারের কাছে, কেউ যায় বাঙালী দুজন উকিলের যে কোন একজনের কাছে বা অন্য কোন উকিলের কাছে।

কাউন্টারের সাহেব দরখাস্তখানা হাতে নিয়ে দরখাস্তকারীর দিকে এক নজর দেখলেন। বুঝতে পারলেন নবাগত। ঠিক এ সময় ভেতর থেকে ছোট একটা চিরকুট দিয়ে গেল একজন। কাউন্টার সাহেব চিরকুট হাতে নিয়ে একজনের নাম ধরে ডাকলেন। লাইনের পেছন থেকে একজন এগিয়ে এল। কাউন্টার সাহেব বললেন, কৈ আপনার পাসপোর্ট? পাসপোর্ট দিতেই তিনি বললেন তিনটার পরে আসেন। বুঝা গেল এই ভদ্রলোকের জন্য কেউ কোন এঙ্গেল থেকে কোন সুপারিশ করেছে। তাই তার জন্য এই বিশেষ সেবা। তারপর কাউন্টার সাহেব লাইনের ভদ্রলোককে বললেন, দুজন সাক্ষী লাগবে। নিয়ে আসেন। বলে দরখাস্ত ফেরত দিলেন। ভদ্রলোক লাইন থেকে বেরিয়ে পাশেই দাড়িয়ে ভাবছেন, এখন দুজন সাক্ষী কোথায় পাবে। এতদূর থেকে আবার আসতে হবে। আমান লাইনে, আনিস তার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে আর লক্ষ করছে। লোকটার অসহায় চেহারা দেখে আনিস এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনার সাক্ষী লাগবে? দিন আমি একটা সাক্ষী হব। তারপর আমানকে বলল একটা সই করতে। আমান অস্বীকার করল।

বলিস কি! ভদ্রলোক অসুবিধায় পড়েছে। একটা সই করতে অসুবিধা কোথায়?

তুই জানিস না এখানে সই করা ঠিক নয়। আমি জানি এই ভদ্রলোক বাঙালী। কোন বাংলার তা জানি না। বাংলাদেশে কি ছিলেন তা না জেনে সই দেব কেন? তুই বা দিতে গেলি কেন? জানিস রাজাকার পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে এসে বাংলাদেশী পাসপোর্ট বানায়?

তখন আনিসের খেয়াল হল। তাইত! এই নিয়মের ভেতর একটা রাজাকার অনায়াসে পাসপোর্ট পেয়ে যেতে পারে। বন্ধ করার উপায় কি!

কোন উপায় নেই। আমান বলল। শুনেছি পশ্চিম বাংলার মানুষও বাংলাদেশী হয়ে গেছে, অনেক পাকিস্তানী, কিছু ইন্ডিয়ানও হয়ে গেছে। কারণ তাদের দেশের পাসপোর্ট অত সহজে হয়না। বিশেষ করে সব রাজাকার এখন বাংলাদেশী পাসপোর্ট পেয়ে গেছে। এই যে এ্যাম্বেসির ষ্টাফ দেখছ তাদের কিছু লোক আছে। তারা এই ব্যবসাটা করে। মানুষ যোগায়, টাকার বদলে পাসপোর্ট দিয়ে দেয়। তারা জানে কাকে দিচ্ছে।

এসব বন্ধ করার জন্য কেউ সরকারের কাছে লেখেনা কিছু?

এ ব্যাপারে কিছু লেখা উচিত না। সব কাজেরই ভাল মন্দ দুটা দিক থাকে। এই পাসপোর্টের ব্যাপারটা নিয়ে লেখালেখি করলে অনেকেই বিপদে পড়ে যাবে। আমার কথাই ধর। আমি এসে সহজেই পাসপোর্ট বদল করে দরখাস্ত করে দিয়েছি। এভাবে কত বাঙালী উপকৃত হচ্ছে ভেবে দেখ। যারা এদেশে আসে কয়টা লোক ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসে। সবাই তো দু নম্বর। এসেই পাসপোর্টের প্রয়োজন হয়। কিছু রাজাকার আর অন্য দেশির জন্য এটা একবারে বন্ধ করে দিলে অনেকেই বিপদে পড়ে যাবে। এসময় আমানের লাইন এসে গেল। পাসপোর্ট রিনিউ করতে হবে। কাউন্টার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আর্জেন্ট না নরমাল?

আর্জেন্টের ফি নরমাল ফির চেয়ে দ্বিগুন। কাজ একই।

নরমাল কয়দিনে দিবেন?

চার সপ্তাহ লাগবে।

আর্জেন্ট কয় দিন লাগে?

দুদিন।

আমানের তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। বলল, আর্জেন্টই দেন।

আর্জেন্ট আর নরমালের মাঝে একটা অঙ্ক আছে। নতুন একটা পাসপোর্ট তৈরি করতে এগার মিনিট সময় লাগে। খালি বই প্রস্তুত আছে। তাতে নাম ঠিকানা ইত্যাদি লেখতে বড় জোড় দশ মিনিট লাগে। তারপর সিল দিয়ে বড় সাহেবের সই নিতে আর এক মিনিট। আর রিনিউ করতে শুধু একটা সিল দিয়ে তাতে তারিখ লেখে সই করা। তার জন্য আর্জেন্ট আর নরমালের প্রয়োজন হয় না। এটা করা হয়েছে যারা অপেক্ষা করতে পারেনা তাদের পকেট থেকে কিছু বের করে নেয়া।

আমানের কাজ শেষ হতেই কাউন্টার খালি হয়ে গেল। সেই ভদ্রলোক কি মনে করে আবার কাউন্টারে গেলেন। গিয়ে কাউন্টার সাহেবের হাতে কি যেন দিলেন। কাউন্টার সাহেব একটা হাসি দিয়ে তার হাত থেকে দরখাস্তটা নিয়ে বললেন, ঠিক আছে কাল চারটার পর আসেন। কাউন্টার সাহেব এই প্রথম হাসলেন। নোটের উপর। কত বড় নোট তার উপর নির্ভর করে তার হাসির সাইজ। হাসির সাইজটা বড়ই মনে হল।

আনিস লক্ষ করল। বলল, আমান এখানে দেখছি বাম হাতের কাজও হয়?

এটা তো সামান্য জিনিষ। পুকুর চুরি নয়। এ্যাম্বেসিতে যারা কাজ করে তারা তো সবাই রাজা। তাদের চেহারা দেখ। মনে হয় চর্বি ভর্তি। কত সুখি। এই লোকগুলো যখন বাংলাদেশে ছিল তখন বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাজারের এ মাথা থেকে সে মাথা ঘুরত অঙ্ক মিলানোর জন্য। বাজারের খরচের অঙ্ক। মিলতনা। মাসের পনের দিন পর টান পড়ত। এখন এখানে এরা সবাই এ্যাম্বেসেডর। সুযোগ সুবিধার শেষ নেই। বিদেশী মুদ্রায় বেতন, অন্যান্য যত রকম ভাতা সব পায়। বড় সাহেবদের ঘরভাড়া নিয়ে কিছু লেখালেখি হয়েছে। সরকার তাতে কর্নপাত করেনি। বড় সাহেবদের চাকর আনার সুযোগও আছে। চাকর আনার নামে বড় ধরনের আদম ব্যবসা হয়। কর্মচারির প্রায় সকলেই নিজ নিজ আত্নীয় আনার ব্যবস্থা করে থাকে। কত রকমের রাস্তা তারা তৈরি করতে পারে তারাই জানে। খরচ পত্র? এ তো গৌরিসেনের টাকা। বাংলাদেশ গরীব নয়। এ্যাম্বেসীতে আসলেই বোঝা যায়। যত বেশি খরচ করা যায়। একজন বড় সাহেবের ঘর ভাড়া দিয়ে কয়েক শ পরিবার বাংলাদেশে অনায়াসে চলতে পারে। আর যখন কোন মন্ত্রী সফরে আসে তখন তো পোয়া বারো। খরচ আর খরচ। এক লাখ হলে পাঁচ লাখ লিখে রাখা সোজা। এসব হিসাবের অডিট খুব কম হয়। হলেও নিজেদের লোক দিয়ে অডিট হয়।

বর্তমানে যিনি কনসুলার জেনারেল তিনি নাকি পলিটিকেলি নিয়োগপ্রাপ্ত। তার যোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবেনা। কারন তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত। তবে তিনি মানুষ হিসেবে খুবই ভাল বলে শুনেছি। তিনি চেষ্টা করছেন এই সব অনিয়ম আর ভাওতার ভাউচার বন্ধ করার জন্য। তাতে তিনি নাকি কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন। প্রবাসীরা এই কন্সুলারকে খুবই পছন্দ করে।

-৩৫-

মেসি'তে সেল দিয়েছে। এক সপ্তাহ চলবে। মেসি একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর। যখন তখন সেল দেয়। অনেক কম দামে জিনিস বিক্রি করে। সেল দিলে মানুষের খবর হয়ে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিছু জিনিস আছে যেমন শীতের কাপড়। শীতের শেষে অর্ধেক দামে ছেড়ে দেয়। মানুষ তখন পরের বছরের জন্য কিনে নেয়। লতার

কাছে খবরটা পৌঁছেছে। ইসলামী জলসার একজন মহিলা খবর দিয়েছে। লতার খুব ইচ্ছে সেখানে যাবার। একা যেতে ভাল লাগেনা। তাই আনিসকে বলেছে সাথে যেতে। শুক্রবার সকালে যাবে স্থির হল।

মেসি'তে মনে হয় পৃথিবীর সব জিনিষই আছে। লতা মেয়েদের বিভাগে আগে গেল। কি কিনতে এসেছে সে নিজেই জানেনা। যা পছন্দ হবে তাই কিনবে। প্রসাধনী থেকে পোষাক সব ঘুরে দেখল। একটা জিনিষও কিনেনি। পছন্দ হয়েছে কিনা তা বুঝা গেল না। আনিস একটা পুতুলের মত তার পেছন পেছন চলছে। তারপর গেল পুরুষের বিভাগে। পোষাক দেখছে। কিছু পছন্দ হয়েছে। দুটা সার্ট, দুটা পেন্ট। একটা জিন্সের পেন্ট। যা পছন্দ হচ্ছে তা আনিসের হাতে তোলে দিচ্ছে। আনিস বাজারের মিস্তির মত সব হাতে নিয়ে তার সাথে সাথে চলছে। ভাবছে সৈয়দ সাহেব এত পোষাক দিয়ে কি করবে। শীতের পোষাকের বিভাগে গেল। অনেক সুন্দর সুন্দর পোষাক। ল্যাদার জেকেট, লং কোট, শর্ট কোট, সুয়েটার ইত্যাদি সব এখন সেলে। লতা খয়েরি রংএর একটা ল্যাদার জেকেট আনিসের কাধে ঝুলিয়ে দেখল। বলল, বেশ মানিয়েছে তো! তোমার কি রং পছন্দ হয়?

আমার রং দিয়ে কি হবে? আমি তো নিচ্ছি না এসব। আমার অনেক আছে।

অনেক থাকলেও নতুন ডিজাইন কিনতে হয়। এই বয়সেই নতুন নতুন পোষাক পরবে। বয়স বেড়ে গেলে আর ইচ্ছে হবে না বা মানাবেও না। তোমার পছন্দের রং কোনটা?

আমার রঙের কোন বালাই নেই।

তাহলে এটাই মানিয়েছে। সাইজ একটু বড়ই ভাল।

সাইজ তো পরে। আমি সাইজে আছি কিনা দেখতে হবে আগে।

তুমি সাইজ হয়ে যাবে। নাও, ধর দেখি। বলে আনিসের হাতে তোলে দিল। তারপর আনিসকে বলল, একটা শপিং কার্ট নিয়ে আস। এগুলো আমার হাতে দিয়ে যাও। বাইরে আছে শপিং কার্ট।

শপিং কার্ট নিয়ে আনিস ফিরে এলে তারা রওয়ানা দিল সুটের বিভাগে। কত সুট! কত রঙ! সব রংই পছন্দ হয়। এসব সুটের কি ফিনিসিং! কয়েকটা রং দেখে লতা একটা নেভি ব্লু রং পছন্দ করল। আনিসকে বলল, লম্বা মানুষকে সুটে খুব মানায়। তোমাকে এটা খুব মানাবে। সাইজটা দেখে নাও।

আমি তো সুট কিনব না। সৈয়দ সাহেবের জন্য নিয়ে যান।

সৈয়দ সাহেব সুট পরে না। লতা বলল, তুমি আমার ব্যথাটা জাগিয়ে দিও না। আমার কত স্বপ্ন ছিল! আমার মনের মানুষকে আমার ইচ্ছেমত পোষাক কিনে দিব। এই কয় বছরে একটা পোষাকও কিনে দিতে পারলাম না সৈয়দ সাহেবকে। আমার যা পছন্দ হয় তা সে পরেনা। তার পোষাক আলাদা। ইসলামী। মানুষের পরনে যখন সুন্দর পোষাক দেখি তখন ইচ্ছে হয় আপন কারও জন্য এসব পোষাক আমি কিনি। ভাইয়ার জন্য দুটা পাঠিয়েছি। কিন্তু আমি তো আর দেখলাম না ভাইয়াকে কেমন মানিয়েছে, দেখতে কেমন লাগে। তুমি মনে করোনা মেয়েরা শুধু রান্না ঘরেই সুখি মানুষকে খাইয়ে। কারও কারও শান্তি মানুষকে পরিয়ে। আজ আমার ইচ্ছে হয়েছে তোমাকে কিনে দিব আমার পছন্দ অনুযায়ী। কোন কিছুতে না বলতে পারবে না বলে দিলাম। তাহলে তোমার সাথে আড়ি।

আনিস হাবা গোপালের মত চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল, এত সব জিনিষ কিনছে তার জন্য অথচ তার মতামত জানার প্রয়োজন মনে করছে না, ব্যাপারটা কি! মনে হয় তার ভেতর একটা জিদ চেপেছে।

এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় শেষ লাইনে লতার চোখ গেল। আর একটা বিস্কুটা কালারের সুট। হাত নিয়ে দেখল। ইটালির তৈরি। সাইজ দেখল। হ্যাঙ্গার সহ ভাজ করে কার্টে রাখল।

আনিস বলল, এটাও নিচ্ছেন কেন? একটা নিলেই তো হয়।

আমি তো খরচ করার সুযোগ পাই না। আমার যা প্রয়োজন তা হাজার ডলারের উপরে যায় না। অথচ খরচের জন্য আমার অনেক টাকা আছে। আজ একটা সুযোগ পেলাম।

আনিস কি বলবে ভেবে পেলনা।

প্রসাধনী বিভাগে গিয়ে অনেক ধরনের লোশন, ক্রিম নিল। কোনটা পায়ের, কোনটা গায়ের, হাতের বা মুখের। এসব লতার নিজের জন্য। লিপস্টিক দেখছে। কত রং! একটা লাল রঙের লিপস্টিক হাতে নিতেই আনিস বলে উঠল, লাল নিচ্ছেন কেন? এসব উগ্র রং। ভাল দেখায় না।

তুমি কি মনে করো আমি উগ্র নই?

আপনি উগ্র হতে চাইলেও পারবেন না। বিধাতা যখন মানুষ তৈরী করে তখন কয়েকটা ফরমেট অনুযায়ী করেছে। সেই ফরমেট অনুযায়ী কেউ এসেছে শাসন করতে, কেউ এসেছে শাসিত হতে। কেউ এসেছে শান্তির বাণী প্রচার করতে, কেউ এসেছে অশান্তি সৃষ্টির স্বভাব নিয়ে। কেউ এসেছে সুন্দরের উপমা নিয়ে এই কদাকার পৃথিবীকে আলোকিত করে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতে, আর কেউ এসেছে শুধুই সুন্দরের পূজা করতে। যারা শাসিত হতে এসেছে তাদেরকে শাসন করতে দিলে তা তারা করবে না বা পারবে না। যারা শাসন করতে এসেছে তারা শাসিত হতে গেলেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। শাসিত হতে চায় না। যারা অশান্তির ফরমেটে এসেছে তারা যে কোন উপায়ে পৃথিবীতে বিভেদ ছড়িয়ে যাবেই। আর যারা আপনার মত রূপের আলো নিয়ে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিতে এসেছে তারা কোন অশোভন কাজ করতে পারে না। তারা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি। তারা সুন্দর, তাদের সবকিছুই সুন্দর। আপনি অসুন্দর কোন জিনিষও ব্যবহার করতে পারেন বলে মনে হয় না।

বেশ কথা জান তো দেখছি! এটা তো লাল নয়, উপরের খাপটা লাল। আসলে ভেতরে হল ক্রিম কালার। তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি লাল লিপষ্টিক পছন্দ করি না।

আপনাকে তো কোন প্রসাধনী ব্যবহার করতে দেখি না। এতসব কিনলেন কেন? কখন ব্যবহার করবেন?

অনেক জিনিষ আছে ব্যবহার না করলেও থাকতে হয়। মনের শান্তির জন্য।

আপনার তো প্রসাধনীর প্রয়োজনই নেই। প্রসাধনী ছাড়াই আপনাকে মানায় ভাল।

হঠাৎ করে আমার এত প্রশংসা শুরু করলে কেন? ভেতরে প্রেম জেগে উঠেছে? ভুল যায়গায়। স্কুল কলেজে অনেকে চেষ্টা করেছে। কাজ হয়নি। এবার প্রশংসা বন্ধ করে চল যাই ক্রোকারি বিভাগে।

যা বাস্তব তাই বলছি, কাউকে পটাতে চেষ্টা করছি না।

ক্রোকারিজ বিভাগে যা দেখে তাই পছন্দ হয়। এক গাদা ক্রোকারি নিয়ে চারটা বেগ ভরে তারা রওয়ানা দিল। সাবওয়েতে এসে আনিস বলল, আমার জন্য এতগুলো টাকা খরচ করার প্রয়োজন ছিল না।

আমার মামা বলতেন বিনা লাভে কেউ কিছু করে না এ পৃথিবীতে। তিনি খুব মজার মানুষ। মানুষকে শুধু হাসায়। একটা সিগারেট কাউকে দিলেও তিনি বলেন এটা তাঁর ইনভেষ্টমেন্ট। কোন একদিন একটার বদলে কয়েকটা আসবে। সবকিছুতেই মামা খুজে বেড়ান ইনভেষ্টমেন্ট।

ধরে নাও এটা আমার ইনভেষ্টমেন্ট। তুমি যখন চাকরি করবে তখন তা ফিরে আসবে কতগুন হয়ে কে জানে!

-৩৬-

শনিবারে বাহারের বাসায় ছোট একটা আড্ডা হচ্ছে। লতাও আছে। বিন্দু বোধ হয় এই প্রথম কোন মহিলাকে আপন করে নিয়েছে। মানুষ কখনও কারও প্রতি কোন কারনে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিন্দু লতার প্রতি কেন, কোন্ ব্যাপারে দুর্বল হয়েছে বুঝা যায় না। তবে লতার সাত খুন মাফ তার কাছে। লতা যখনই আসে বিন্দুকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। কোন সময় বিন্দুকে না জিজ্ঞেস করেই লতা কিছু কাজ করে ফেলে। বিন্দু আরও খুশি। মাঝে মাঝে চারজন মিলে গল্প করে।

আনিস ঠিকানা পত্রিকাটা দেখছিল। শেষের পাতায় গিয়েই সে থেমে গেল। বলল, বাহার ভাই দেখুন একটা খবর! "গত সপ্তাহে চারজন গৃহবধুর গৃহত্যাগ..." আনিস কাগজটা বাহারের হাতে দিয়ে বলল, বাহারভাই এখানে বাঙালীই বা কতজন তার মধ্যে এক সপ্তাহে যদি চারজন বধু চলে যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত থাকবে কয়জন?

এ খবরটা সম্পুর্ণ নয়। তাই তোমার বুঝতে একটু কষ্ট হবে। সব সময় বধুরা গৃহত্যাগ করেনা। মাঝে মধ্যে। অনেকে গৃহেই থেকে যায়। স্বামীবর বহিস্কার হয়। গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। যারা স্বামীকে বের করে দিয়ে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে গৃহে অবস্থান করে তাদেরকে কি বলবে? সে খবরটা কিভাবে ছাপা হবে? খবর আরও আছে, অবশ্য পুরাতন। যেমন গৃহত্যাগ। গৃহ ছিল বলেই ত্যাগ করেছে। যাদের গৃহই হয়নি বা হবার আগেই ত্যাগ করে সেটাকে কি বলবে?

কথাটা ধরতে পারলাম না বাহার ভাই, শানে নজুলটা একটু বলুন না।

সে ত একটা গল্প।

গল্পই তো শুনতে চাই।

তবে শোন গল্পটা - বলে বাহার শুরু করল:

যাদের কথা বলছি তাদের আসল নাম বলবনা। কারন তারা দুজনই আমার খুব পরিচিত। ধর একজনের নাম শামিম আর একজন নিজাম।

কেনেডি এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন শেষে বাইরে এসে শামিম জিজ্ঞেস করল, এখন যাবি কোথায়?

একটা ঠিকানা আছে। আমার মামাতো বোনের খালাতো দেবরের শালা। চল্, আপাতত ওখানে যাই - নিজাম বলল।

তারা দু বন্ধু। হরিহর আত্মা। ছোটবেলা থেকেই একই স্কুল থেকে শুরু করে বি,এ পর্যন্ত এক সাথে থেকে একই কলেজ থেকে পাশ করেছে। একই সাথে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য দরখাস্ত করে এক সাথেই ভিসা মিলেছে। একই ফ্লাইটে নিউইয়র্ক এসে পৌছেছে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে ঠিকানা দিল নিজাম। ২৪০ ইস্ট ১৭ স্ট্রিট, ব্রুকলিন। নিউইয়র্ক।

ট্যাক্সি ঠিকানামত দরজার সামনে নামিয়ে দিল। নিজাম ঠিকানা মিলিয়ে দেখল। একদম মিলে গেছে। দরজার পাশে একটা বোর্ডে লেখা আছে - আবদুল খালেক। নামটা বরাবর বোতাম টিপতেই একজন এসে ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল - হো ইজ দিস?

আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

কাকে চান?

আমরা খালেক সাহেবের কাছে এসেছি। আপনি কি খালেক সাহেব?

না, আমার নাম মোতালেব। আসেন ভিতরে আসেন বলে দরজা খুলে দিল।

ভেতরে যাবার সাথে সাথেই নিজামের নাকে একটা বোসকা গন্ধ এসে লাগল। শামিম নিজামের দিকে তাকাল। মোতালেব বলল, বসেন। খালেক সাহেব বাথ রুমে।

ঘরের একপাশে হাতল ভাঙা দুটা চেয়ার আছে। বাকী সবটায় ফ্লোরের উপর ঢালাও বিছানা। বিছানা এত নোংরা যে জানালা বন্ধ বলে ঘরে একটা অস্বাভাবিক ডিপ্রেশনের সৃষ্টি হয়েছে। বাইরে থেকে যারা যায় তাদের প্রথমত নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। কতক্ষন বসে থাকলে আস্তে আস্তে সয়ে যায়। তখন আর এমন তীব্র আকারে দংশন করেনা।

দুজনে দুটো চেয়ারে বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে হল ঢাকার ইসলামপুরের কোন একটা স্যাঁত স্যাঁতে বাড়ির নীচের তলার কামরা। এই একটা কামরায় ছয় জন থাকে। কারন বালিশ দেখা যায় ছয়টা। শামিম মনে মনে ভাবলা, এটাই বুঝি আমেরিকা! এই আরামের জন্যই মানুষ পাগলের মত ছুটছে।

নিজাম ভাবছে, খালেক সাহেবের একটা জুতার দোকান ছিল জানতাম। দোকাটা খুব ভাল চলছিল। সে ব্যবসা ছেড়ে এখানে এ অবস্থায় কেন পড়ে আছে! ঘরে যে সব লোকজন দেখা যাচ্ছে মনে হয় সবাই দিন মজুর। এসব লোকের সাথে এ অবস্থায় থাকে! খালেক সাহেব বাথ রুম থেকে বের হয়ে নিজামদের দিকে তাকিয়ে আছেন। কোথায়ও দেখেছেন বলে মনে পড়ছেনা।

নিজামই পরিচয় দিল। পরিস্কার করে পরিচয় দিতে বেশ কিছুক্ষন লাগল।

তারপর শুরু হল আলাপ। এসে যখন পড়েছি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আপাতত থাকার জায়গা, তারপর কাজের ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা করতেও চার পাঁচ দিন লেগে গেল। এই চারপাঁচ দিন এই ছয়জনের সাথেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হল। তখন আর বোসকা গন্ধটা নাকে লাগেনা। গা সহা হয়ে গেছে।

নিজাম বলল, আমার কাছে দুহাজার ডলার আছে। আপাতত কোথায়ও উঠি। তারপর অন্য চিন্তা। লেখাপড়া তো করতেই হবে। যদি পারি লেখাপড়া চালিয়ে কাজ করব। চারশ ডলার দিয়ে দুজনে একটা ষ্টুডিও ভাড়া নিল। সেই থেকে দু বন্ধু আছে এক সাথে।

লেখাপড়ার কথা শুনলে শামিমের গায়ে জ্বর আসে। তাই এখানে এসেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। কাজের ব্যাপারে খালেক সাহেবই সাহায্য করেছেন। শামিম বেশীদিন কোথায়ও টিকেনা। কিন্তু বেকার থাকেনা। যখন যা পায় তাই করে। আর নিজাম লেখাপড়া ছাড়েনি। পার্ট টাইম কাজ করে লেখাপড়া চালিয়ে গেছে। আসার সময় তিন মাস দেরী হল শুথু শামিমের টাকা জোগাড় হয়নি বলে। শেষ পর্যন্ত নিজামও কিছু ধার দিয়েছে।

নিজাম কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হয়ে এসেছে এবং এই বিষয়েই লেখাপড়া করছে। নিজামের যা লাগে শামিম আগে থেকেই এগিয়ে দেয়। লেখাপড়া করে বলে শামিম নিজামকে সমীহ করে। তাকে সাহায্য করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকে। এই সাত বছরে দুজনেই দুদিকে উন্নতি করেছে। শামিম অজস্র ডলার কামাই করেছে আর নিজাম কম্পিউটারে এম এস ডিগ্রি নিয়েছে।

নিজামের ভিসা নষ্ট হয়নি। বাড়িয়ে বাড়িয়ে ভিসা ঠিক রেখে লেখাপড়া করেছে। এখন একটা বড় কোম্পানীতে নিজামের ভাল চাকরি হয়েছে। কোম্পানী তাকে গ্রীন কার্ড দিয়েছে।

শামিমের ভিসা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। ১৯৮৮ সালে একটা এমনেস্টির অধিনে সে দরখাস্ত করেছিল। অস্থায়ী গ্রীণ কার্ড পেয়ে গেছে। কিছুদিন পরেই স্থায়ী গ্রীণ কার্ড পেয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ইদানিং শামিম ট্যাক্সি চালায়। কাচা পয়সা।

পয়সা হলে মানুষের তিনটা জিনিষ দরকার হয়ে পড়ে। নারী, বাড়ী, গাড়ি। শামিমের গাড়ি আছে। একটা পুরনো গাড়ি কিনেছে কিছুদিন হল। সপ্তাহে একদিন ছুটি কাটায়। সেদিন নিজামকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশে তার গ্রামের বাড়ীটা পাকা দালান করে, বিরাট আটচালা বৈঠকখানা করে দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাসাবোর কদমতলায় একটা বাড়ী কিনেছে আট লাখ টাকা দিয়ে। এখন বাকী রইল একজন নারী। এই নারীর সন্ধানে বাংলাদেশে যাচ্ছে। তিন মাস আগেই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে মেয়ে দেখে রাখার জন্য। সবচেয়ে সুন্দরী পাত্রী চাই।

সবচেয়ে সুন্দরী পাত্রী বিয়ে করে তিন মাস হানিমুন করে আবার ফিরে এল আমেরিকায়। নববধু লিপিকে কথা দিয়ে এসেছে যত শিগগীর পারে নিয়ে আসবে। গ্রীণ কার্ডটা স্থায়ী হলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন রাতদিন লিপিই তার চোখে ভাসে। দিন গুনে কবে আনতে পারবে। ঠিক এ সময় তার গ্রীণ কার্ড বাতিল হয়ে গেল। ইমিগ্রেশন জানিয়ে দিয়েছে তার দরখাস্ত নামনজুর এবং অস্থায়ী কার্ড যা দিয়েছিল তা বাতিল।

শামিম দিশে হারা হয়ে গেল। এখানে থাকার কোন অসুবিধা নেই। লিপিকে কিভাবে আনবে সেই চিন্তা। দু নম্বর, তিন নম্বর রাস্তাগুলো সব চেষ্টা করেও বিফল হল।

নিজাম বাংলাদেশে যাবে বেড়াতে। এ সুযোগে শামিম নিজামকে বলল, আমার বউটা তুই নিয়ে আয় তোর সাথে। খরচ যা লাগে আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি। কিভাবে আনতে হবে সে বুদ্ধিও দিয়ে দিল। নিজাম কোন আপত্তি করেনি। এটা এমন কিছু না। বন্ধুর এ উপকারটুকু না করলে কিসের বন্ধুত্ব।

শামিম বলল, তোরা আসার আগেই আমি দু বেড রুমের একটা বাসা নিয়ে নিব। না হয় তুই কোথায় থাকবি?

তারপর লিপির এবং তার আত্মীয়স্বজনের জন্য জিনিষপত্র কিনে বড় একটা সুটকেইসে ভরে নিজামকে এয়ারপোর্টে বিদায় দিয়ে এল।

এখন শামিম দিন গুনছে। আর মাত্র দু মাস। আর একবার ফুলশয্যা হবে নিউইয়র্কে। নতুন একটা বাসা নিল দু বেড রুমের। একটায় নিজাম, আর একটায় ওরা থাকবে। খুব দামি দামি জিনিষ কিনে মনের মত করে ঘর সাজিয়ে অপেক্ষা করছে শামিম।

লিপি আমেরিকায় যাচ্ছে খবরটা শুনে তাদের বাড়ীতে একটা ছোটখাট উৎসব হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, নিজাম প্রধান অতিথি। লিপি যখন শুনল যে পাসপোর্টে স্বামীর নাম লিখতে হবে নিজাম, তখনই একবারে বেজার হয়ে গেল। অনেক উদাহরণ, ব্যাখ্যা, আলোচনার পর বেজার ভাবটা কেটে গেল। পাসপোর্ট থেকে ভিসা লাগানো পর্যন্ত নিজামই সব কিছু করল। অনেক সময় তার নিজের প্রয়োজনীয় কাজ বাদ দিয়েও। তার ইচ্ছে হয় লিপির সাথে সাথেই সারাক্ষণ থাকে।

শামিম প্রতিদিন টেলিফোনে খবর নিচ্ছে। যেদিন শুনল ভিসা লেগে গেছে সেদিন তার আনন্দ দেখে কে! নিজামকে বলল, আর দেরী করিস না। পরের ফ্লাইটেই চলে আয়। এদিকে সব ঠিক ঠাক করে রেখেছি।

পরের ফ্লাইটে নিজাম লিপিকে নিয়ে বিমানে আরোহণ করল নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে।

লিপি যখন নাচতে নাচতে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নিজামের পাশাপাশি উপরে উঠছিল তখন নিজাম বলল, ভাবী, আপনি যে এত সুন্দরী তা ছবি দেখে কিন্তু বুঝা যায়না। সত্যিই আপনি অনিন্দ্য সুন্দরী।

লিপি আড়চোখে তাকিয়েছিল। না বুঝার ভান করে।

বিমানে পাশাপাশি দুজনে বসে নিজাম জিজ্ঞেস করল, ভাবী, আপনি কি জাতের সুগন্ধি ব্যবহার করেন? আপনার গায়ের গন্ধে সমস্ত বিমান মাতাল হয়ে গেছে!!

না তো! কোন সুগন্ধি ব্যবহার করিনি তো!

তাহলে আপনার গায়ে এ কিসের গন্ধ?

বোধ হয় তেলের গন্ধ।

এমনি করে আলাপ চলল। চব্বিশ ঘন্টার জার্নি। মুখ বন্ধ করে তো থাকা যায়না। এই দীর্ঘ সময়ে, ২৪ ঘন্টার মাঝে পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যেতে পারে, একটা দেশ অনায়াসে জয় করা যেতে পারে।

নিজাম একাউন্টেন্ট। কম্পিউটারে হিসাব কিভাবে মিলাতে হয় তা সে জানে। গত দুটা মাস নিজের ট্রায়াল ব্যালান্স মিলাতে চেষ্টা করেছে। ডেবিট ক্রেডিটে কোথায় যেন একটা অমিল হচ্ছে। যেভাবেই হোক মিলাতে হবে। ডেবিট ক্রেডিট সমান সমান হতে হবে। না হয় কিসের একাউন্টেন্ট!

লিপিকে বলল, এখন কিন্তু আপনি আমার স্ত্রী। এয়ারপোর্টের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার স্বামী, মনে থাকবে তো?

হ্যা, থাকবে।

ভুল হলে কিন্তু ইমিগ্রেশন আটকে দিবে।

তা জানি।

সত্যি সত্যি যদি আমরা স্বামী-স্ত্রী হতাম তাহলে কেমন হতো?

আপনি বিয়ে করছেন না কেন?

আপনার মত সুন্দরী পাইনি বলে। এমন রূপবতি পেলে ধন্য হতাম।

ঠিক আছে, আমার চেয়ে সুন্দরী দেখে খুজে বের করব।

না, না আপনার চেয়ে সুন্দরী নয়! ঠিক আপনার মত। ঠিক এই চাহনী, এই চোখ, এমন চুল, ঠিক এমন হলুদ রং। এর বেশি নয়।

সবকিছু কি একই রকম মিলে? তা কি সম্ভব?

চেষ্টা করলে সম্ভব।

এসব কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজাম লিপির গায়ে চাদরটা তোলে দেয়, বালিশটা ঠিক করে দেয়। আলাপের মাঝে কোন সময় যে তারা গায়ে গায়ে লেগে বসে আছে কেউ খেয়াল করেনি। এক সময় লিপির ঘুম পেয়ে গেল। কিন্তু অসুবিধা হল বসে ঘুমানোর অভ্যেস নেই। একটু শুতে হবে।

নিজাম বলল, মাঝখানের হাতলটা উঠিয়ে দেই। দুজনের সিটে আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনি যতক্ষণ ঘুমাবেন ততক্ষন আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

তা কি হয়! আপনি দাড়িয়ে থাকবেন আর আমি ঘুমাব! তার চেয়ে আপনি একপাশে সরে বসুন, আমি গুটিশুটি হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।

দেড় সিটের মাঝে নিজামের দিকে মাথা রেখে লিপি শুয়ে পড়ল। পায়ের অর্ধেক বাইরে। গুটিশুটি হয়েও শোয়া যায়না।

নিজাম বলল, আমার কোলের উপর মাথা রাখুন। তাহলে অন্তত শোয়া যাবে।

লিপি একটু ইতস্তত: করে নিজামের কোলের উপর মাথা রাখল।

নিজামের বাঁ হাতটা হাতলের উপর। ডান হাতটা লিপির কপালে। ধীরে ধীরে, খুব যতনে লিপির কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নিজাম। লিপি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। মনে হয় সংজ্ঞা হারিয়েছে।

নিজাম বলল, কপালটা একটু টিপে দিই?

লিপি মৃদু হাসল।

নিজাম লিপির কপাল টিপে দিচ্ছে। খুব মোলায়েম করে, অনেক যতনে। আরও ধীরে, নিজামের হাতটা এক সময় অনেক দেশ, পাহাড়, নগর, বন্দর ঘুরে এল। সময় বেশি লাগেনি। দুতিন ঘন্টা মাত্র। লিপি ঘুমে না আবেশে অচেতন না সচেতন তা বুঝা যায়নি।

খাবার এল। নিজাম বলল, ভাবী উঠুন। খাবার এসেছে।

তারপর নিজেই ভাবীকে খাবার পরিবেশন করল। শুধু মুখে তোলে খাইয়ে দেয়া বাকি রইল।

নিজামের চিন্তা তার ট্রায়াল বেলেন্স মিলছেনা।

খাবার পর নিজাম বলল, দেখি ভাবী। আপনার হাতটা দেখি।

নিজাম জীবনে কখনো হাত দেখেনি। হস্তরেখা কোন্‌টার কি নাম তাও জানেনা। সেই কিনা বলে বসল, আমি হাত দেখতে পারি। দিন দেখি হাতটা - বলে লিপির অবশপ্রায় তুলতুলে হাতটা তার হাতের মুঠোয় নিতেই একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বয়ে গেল দুজনের শিরায় শিরায়। লিপি নিজামের কাধে মাথা রেখে এলিয়ে পড়ল।

নিজাম হাত দেখছে। ঘন্টারও বেশি সময় নিয়ে। লিপির অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব বলে যাচ্ছে। এসব লিপির কানে পৌছছে কিনা বুঝা যায়নি। কারণ হাতটা অবশ হয়ে আছে।

নিজামের জীবনে এই প্রথম যুবতী নারীর করস্পর্শ করা। তার হাত কাঁপছে, কথা জড়িয়ে আসছে। লিপির হাতটা আরও শক্ত করে চেপে ধরে প্রত্যেকটা রেখা পড়ছে। আরও ছোট, সুক্ষাতিসুক্ষ্ম রেখাগুলো খালি চোখে দেখা যায়না বলে একদম চোখের কাছে, একবারে বুকের কাছে এনে পড়তে চেষ্টা করছে। তাও ভাল দেখতে পারছেনা। একবারে মুখের কাছে - এক সময় নিজামের ঠোট স্পর্শ করে গেল।

লিপি চোখ খুলতে পারছেনা। আবেশে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। নাকি লিপিও নিজামের মনের সুক্ষ্ম রেখাগুলো পড়ে নিচ্ছে? সে কি স্বর্গে না মর্ত্যে কিছুই জানে না।

হস্তরেখাবিশারদ তার বুকের সাথে হাতটা চেপে ধরে বলতে লাগল - আপনার বিবাহে শনির দশা আছে। বিয়েতে প্রতারিত হবেন। প্রথম বিয়েতে সুখী হবেন না। দ্বিতীয় বিয়ে আছে আপনার। তাতে দেখা যায় কণ্যা আর সিংহের মিশ্রনে জীবন কুশুমাস্তীর্ন।

লিপি চোখ খুলে হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। কি বললেন? বিয়েতে প্রতারিত হব?

হ্যা, হস্তরেখা তো তাই বলে।

কি ধরণের প্রতারণা হতে পারে?

এই ধরুন, যে সব খবরের উপর ভিত্তি করে বিয়ে হয়েছে, পরে দেখলেন সব মিথ্যা।

এসব বলছেন কেন? আপনার বন্ধুটি কি কাজ করে ওখানে?

সেটা বন্ধুকেই জিজ্ঞেস করবেন।

সে তো বলেছে, সে একাউন্টেন্ট। একটা বিরাট কোম্পানীতে বিরাট বেতনে চাকরি করে। কম্পিউটার সায়েন্সে এম এস করেছে। আমার বাবা বলছিলেন, আজকাল আমেরিকা থেকে যারা বাংলাদেশে বিয়ে করতে আসে তারা অনেকেই মিথ্যা কথা বলে। তাই আমার সব আত্নীয়স্বজন খুব সাবধানে সব খবর নিয়েছে। বাংলাদেশে যা দেখার সব ঠিক ঠিক পেয়েছে। আমেরিকায় তার অফিসে ফোন করে জেনেছে। সেখানে তার চাকরি আছে। এখানে ভুল বা প্রতারণা করার আর কি পথ আছে?

আজীবন বন্ধুত্বের যে মহীরুহ গড়ে উঠেছে নিজাম আর শামিমের মাঝে, আজ নারীলোভে নিজাম তা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। তার প্রতিটা কথা যেন এক একটা কুড়ালের আঘাত। এক একটা কথায় বন্ধুত্বের স্তম্ভগুলো খান খান হয়ে যাচ্ছে। নারীলোভ রাজ্যলোভকেও হার মানায়। ধনদৌলত তার কাছে তুচ্ছ। নারীর জন্য সবকিছুই জলাঞ্জলী দেয়া যায়।

নিজাম বলতে লাগল - কি করব বলুন! বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারিনি। এ অপরাধের জন্য আমিই দায়ী। ওটা আমার অফিস, আমার টেলিফোন। আমিই বলেছিলাম সে ওখানে চাকরি করে। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তার জন্য আমাকে শাস্তি দিন।

শামিম তাহলে চাকরি করেনা?

চাকরি একটা করে, বেকার নেই।

লেখাপড়ার কথাটাও কি মিথ্যে? কিছু লেখাপড়া করেছে?

লেখাপড়া হয়ে উঠেনি তার।

এ খবর বাবার কানে গেলে বাবা নির্ঘাত হার্টফেল করবেন। এত শিক্ষিত পাত্র বাদ দিয়ে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই হল। এই ছিল আমার কপালে! আমার বাবাকে বাঁচাতে হবে - এই প্রতারণার খবর কিছুতেই দেয়া যাবেনা। বাবা এই বিদেশী ডিগ্রীটাকেই বেশি গুরত্ব দিয়েছিলেন। এখানেই এত বড় ফাঁক! লিপি নিজামের হাত থেকে নিজের হাতটা টেনে নিয়ে অনেকক্ষন চুপ করে বসে রইল। বোধ হয় হিসাব মিলাতে চেষ্টা করছে।ট্রায়াল ব্যালেন্স।

নিজাম বলল, আমার কারণে আপনাদের এতবড় ক্ষতি হয়েছে। আমাকেই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আপনার বাবা যা চেয়েছিলেন তা পেলে তো হার্টফেল করবেন না।

লিপি এ কথার উত্তর দেয়নি। সম্মুখে দৃষ্টি রেখে সে যেন কোন অতলে হারিয়ে গেছে।

লন্ডনে বিমান নোঙ্গর করল। এখানে তাদের অবতরণ করার কথা নয়। ঘন্টাখানেক পরেই বিমান রওয়ানা দিবে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে।

নিজাম বলল, চলুন ভাবী, লন্ডনটা দেখে যাই। আর তো আসা হবেনা। এই বলে সে ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। লিপি যন্ত্রের মত তাকে অনুসরন করল। তার মুখে কোন কথা নেই। মনে হয় নিজের বলতে কিছু নেই।

নিজাম ইমিগ্রেশনে গিয়ে এক সপ্তাহের ভিসার অনুরোধ করে পেয়ে গেল। একটা হোটেলে বেগ রেখে বেরিয়ে পড়ল বাজারের উদ্দেশ্যে।

আজ লিপির জন্য লন্ডনের স্টোর খোলা। যা কিনতে চায় কোন বাধা নেই। টাকা দেবে গৌরি সেন। নিজাম যে জিনিষ হাতে পেয়েছে তার জন্য পৃথিবী উজাড় করে দিতে পারে। তিনটা ক্রেডিট কার্ড চার্জ হয়ে গেছে। কোন চিন্তা নেই। যত বেশি খরচ হবে তত তাড়াতাড়ি ট্রায়াল

বেলেন্স মিলবে। যে কোন কিছুর বিনিময়ে ডেবিট ক্রেডিট মেলাতে হবে।

সকালে ঘুম ভাঙল অনেক দেরীতে। নিজাম হিসাব মিলিয়ে দেখল ট্রায়াল বেলেন্স একদম মিলে গেছে।

এদিকে শামিম এয়াপোর্ট থেকে ফেরৎ এসেছে। সব যাত্রী চলে গেছে। লিপি আসেনি। নিজামও না। ঘরে ফিরে বাংলাদেশে ফোন করল। সেখান থেকে বলে দিয়েছে যে ঠিক সময়ই বিমান ছেড়েছে, ফ্লাইট নাম্বার ভুল হয়নি। তবে! গেল কোথায়? কাজকর্ম বাদ দিয়ে শামিম পাগলের মত এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। নিজামের অফিসে খোজ নিল, বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞেস করল। কেউ জানে না।

নিউইয়র্কে তার বন্ধু ফজলের সাথে যোগাযোগ করে নিজাম। বলল, আমার একটা বাসার জরুরী দরকার। বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছি। বাসা না পাওয়া পর্যন্ত আসতে পারছিনা। আজই একটা বাসার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিজামের কপাল ভাল। চারদিন পর খবর পেল ফজলের পাশেই একটা এপার্টমেন্ট পাওয়া গেল। নিজাম লিপিকে নিয়ে নতুন বাসায় উঠল।

তের দিন পর ফজলের সাথে শামিমের দেখা সাবওয়েতে। ফজল বলল, নিজাম তো বিয়ে করে একবারে বউ নিয়ে এসেছে। বউ খুবই সুন্দরী!

তোমার সাথে কোথায় দেখা হল?

আমার বাসার পাশেই উঠেছে। বাসাটা আমিই নিয়ে দিয়েছি।

বাসার ঠিকানাটা কি বলত।

ঠিকানা নিয়ে শামিম নেমে পড়ল সাবওয়ে থেকে। সোজা গিয়ে বাসায় কড়া নাড়তেই নিজাম এসে দরজা খুলে দিল।

কিরে! কি খবর তোর? কেমন আছিস? নিজাম জিজ্ঞেস করল।

লিপি কোথায়? আমি লিপির সাথে দেখা করব।

বস এখানে, ডেকে দিচ্ছি বলে লিপিকে ডাকল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লিপি এসে দেখা দিল। তার পরণে শামিমের কিনে দেয়া সিল্কের শাড়ী, সমস্ত অঙ্গে গহনার ঝিলিক। সবই শামিমের দেয়া। পরের ঘরে দাঁড়িয়ে নিজের স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষন তাকিয়ে রইল শামিম। স্ত্রী সত্যিই হাতছাড়া হয়েছে কিনা জানার জন্যই এসেছে কিছু জিজ্ঞেস করবে বলে। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লিপিই বলতে লাগল - দেখুন আমার বাবা সরকারী অফিসের একটা বিভাগের প্রধান। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা। আমার ভাইরা সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। আমি এম এ। আমার বাবা যেমন পাত্র চেয়েছিলেন ঠিক তেমন পাত্রই আমার জন্য মিলেছে। আমার স্বামী কম্পিউটার সায়েন্সে এম এস। এখন একটা কোম্পানীতে মোটা বেতনে চাকরি করেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী খুব সুখে আছি। আমাদের সুখের সংসারে কেউ ঝামেলা করুক তা আমরা চাইনা। এটা আমেরিকা!

এখানেই গল্প শেষ। এবার বল এই কাহিনীটা খবরের কোন হেডিংএ ছাপবে? তাদের তো গৃহই হয়নি, কাজেই তারা তো গৃহ ত্যাগ করেনি কেউ। বলতে পার গৃহপ্রবেশ হয়নি।

তারপর শামিমের কান্নাকাটিতে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম একটা মিট মাট করা যায় কিনা। কিন্তু লিপির কথার পিঠে কথা আমরা বলতে পারিনি। তার যুক্তির সাথে কোন তর্ক খাটেনি। সে বরং উল্টো বলে যে, শামিমকে সে জেলে দেয়নি এই ঢের। কারণ সে জালিয়াতি করে বিয়ে

করেছে। যারা এ ধরণের জালিয়াতি করে বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করে, তাদের সবারই শাস্তি হওয়া দরকার। শামিম জঘন্য কাজ করেছে, কঠোর শাস্তি পাওয়া দরকার ছিল। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি!

তাদের সংসার এখনও খুব সুখের আছে। গল্পটা কেমন লাগল তোমাদের কাছে?

গল্প তো ভালই লাগল। কিন্তু শামিমের জন্য মনটা কেমন করছে।

ঠিকই আছে, ওদের বড় ধরণের শাস্তি হওয়া দরকার - দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যাতে ভবিষ্যতে জালিয়াতি করে কেউ বিয়ে না করে। এখানে লিপি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার উপযুক্ত বর সে বেছে নিয়েছে। এখন শামিম দেশে গিয়ে তার উপযুক্ত পাত্রি খুঁজে নেবে। এটাই উচিত।

বিন্দু বলল, উপযুক্ত কিনা তা বুঝা যায় ঘর বাধার পর। তখন দেখা যায় কারও মুখোশ খুলে গেছে।

তুমি কি আমাকে খোঁচা দিচ্ছ? বাহার জিজ্ঞেস করল। বলল, তাহলে তো ভালই হবে, আবার নতুন করে খোঁজা যাবে।

না, তোমার কথা বলছি না। আমাদের আশেপাশেই আছে এমন মানুষ।

লতাসহ আর সকলে চুপ করে রইল।

-৩৭-

বরবাদির ভক্ত শফিউল্লার স্ত্রী মারুফা বোরখা পরতে অস্বীকার করেছে। শফিউল্লা শাস্তিস্বরূপ বিছানা আলাদা করে দিয়েছে অনেক দিন হল। তাতে মারুফার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে তার ইচ্ছামত চলছে। বাইরে যায় যখন তখন। শাড়ী পরে। বোরখা ছাড়া। তাতে শফিউল্লা শক্ত হাতে শাসন করার সব রাস্তাগুলো চেষ্টা করে এখন ছমির চাচার উপর ছেড়ে দিয়েছে। ছমির চাচা যখন তখন মারুফাকে আল্লার কালাম শোনায়। মুসলমান মেয়েদের কিভাবে পুরুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে চলতে হয়, মেয়েদের শরীরের কোন্ অংশ পুরুষের দৃষ্টিতে পড়লে কোন্ দোজখের কোন্ অংশে স্থান পাবে, কোরানে বা হাদিসে কি আছে এসব ব্যাখ্যা করে। মারুফা এসব মন দিয়ে শোনে না। কথায় কথায় তর্ক করে। চাচা একটা বললে সে তার নিজের যুক্তি দেখায়। বলে, তাহলে কি বোরখা ছাড়া যেসব মেয়েরা রাস্তায় বের হয় তারা কি সবাই দুজখে যাবে? কয়টা মুসলমান মেয়ে এদেশে বোরখা পরে চলে? বোরখা পরে রাস্তায় বের হলে আমি আমাকে পরিচয় দিচ্ছি আমি মুসলমান। এখানে তো কেউ এমন পরিচয় দেয়না। তাহলে আমি দিব কেন? আর যদি পর্দার ভিতরই রাখতে হয় তাহলে এদেশে এসেছে কেন? দেশে ফিরে গেলেই হয়। এদেশে থাকলে আমি বোরখা পরব না। এদেশে মেয়েরা কাজ করে। আমিও কাজ করব।

মাগো, তুমি ত আমার মেয়ের মত। কথা শোন। এসব বেয়াদপী করোনা। রাত দিন এসব শুনতে শুনতে মারুফা বিরক্ত হয়ে গেছে। চাচা যখন এসব শোনায় মারুফা তখন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। চাচা আদর করে। বলে, মাথাটা একটু টিপে দিই মা। তুমি একটু আরাম কর। সব ঠিক হয়ে যাবে। সব আল্লাহর হাতে। আল্লাই মানুষকে হেদায়েত করবে।

ছমির চাচা মারুফাকে হেদায়েত করতে করতে নিজেও যেন কেমন হয়ে গেছে। শফিউল্লাকে বলল, আরও সময় লাগবে। পোলাপান মানুষ। এ বয়সে মন একটু উতাল পাতাল থাকেই। ধৈর্য ধর।

শফিউল্লার আর ধৈর্য নেই। সে যখনই ঘরে আসে দেখে চাচা হেদায়েত করছে। কোন দিন দেখে চাচা বিছানার পাশে বসে আছে, মারুফা বয়ান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। শফিউল্লা কখন আসে কখন যায় খেয়াল করার সময় পায় না। তার সাথে কথাই বলেনা। চাচা কাজে যায় কিনা বা কখন যায় আর কখন আসে তা সে জানে না। ইদানিংকালে চাচার উপর তার ঈর্ষা বা রাগ কি হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। চাচাকে দিয়ে খুব একটা উপকার হচ্ছে বলেও তার মনে হয় না। একদিন কাজ থেকে ফিরে খাবার টেবিলে গিয়ে একবারে রেগে গেল শফিউল্লা। টেবিলে কিছুই নেই। মানে আজ রান্না করেনি। সারাদিন টিভি দেখেছে আর ঘুমিয়েছে। মারুফাকে ডাকল এদিকে আসতে। অনেকক্ষন পর তার সামনে আসতেই কয়েকটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিল চাচার সামনেই। তার আগের দিন মারুফা তার অনুমতি না নিয়ে বোরখা ছাড়া তো বাইরে গেছেই, তা আবার জিন্সের প্যান্ট সার্ট কিনে এনেছে। সে একটা ইন্ডিয়ান গ্রোসারীতে কাজের কথা বলে এসেছে। সে কাজ করবে! কত বড় স্পর্ধা! মার খেয়ে সেদিন মারুফা কিছুই বলেনি। পরের দিন থেকে মারুফা উধাও। তবে ছমির চাচাও বাসায় নেই। শফিউল্লা ঘরে ফিরে মারুফাকে না দেখে ভেবেছিল হয়ত গেছে কোথায়ও। ফিরবে নিশ্চয়ই। রাত গেল, সকাল হল। কেউ ফেরেনি। চাচাও না মারুফাও না। তাহলে! চাচা কোথায় গেল? মারুফাকে খোজতে? একটা টেলিফোন তো করতে পারত! কি হতে পারে, কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে সে বেরিয়ে পড়ল। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোজ করল। নেই, কোথায়ও নেই। ঘরে ফিরে সে টেলিফোন নিয়ে বসল। প্রথমেই কল করল জামালের বাসায়। এখন বাজে রাত এগারটা। জামাল নিশ্চয়ই বাসায় আছে। কিছু বুদ্ধি দিতে পারবে হয়ত। ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে একটা বাচ্চার গলা শোনা গেল। হ্যালো, কাকে চান?

জামাল সাহেব আছে?

ধরুন, দেখি আছে কিনা বলে বাচ্চাটা অন্যের সাথে কথা বলছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করছে, বাবা তুমি আছ?

বাবা ঘরে থেকেও আছে কিনা এই কথাটা বাচ্চাটা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করছে। বাবা যদি বলে, বল আছি তাহলে সে বলবে, আছে। আর বাবা যদি বলে, বল নেই, তাহলে নেই বলে দেবে। এটা এক প্রকার শিক্ষা। যে যার বাচ্চাকে যেমন শিক্ষা দেয়।

প্রবাসে অনেকেই বাচ্চাদের এমন শিক্ষা দেয়, মিথ্যা বলার জন্য। তারা আগে জিজ্ঞেস করে কে কথা বলছে। যদি পাওনাদার হয় তাহলে নেই। যদি পেয়ারের মানুষ হয় তাহলে আছে। উপেক্ষা করতে চাইলে বলে, আমি আপনাকে ফোন করব। এখন ব্যস্ত আছি। কোন কোন বাচ্চা আছে যারা ভাল বাংলা বলতে পারে না। তারা টেলিফোন ধরে যদি শোনে বাঙালী তাহলে তাড়াতাড়ি রেখে দেয়। যদি নাম লিখে রাখতে বলে তাহলে নাম যা লিখে রাখবে তাতে কে ফোন করেছিল সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ নামটা এমন ভাবে লিখবে যে ধরার কোন উপায় থাকবেনা। এসব বাচ্চাদের এদেশে জন্ম। তারা রহমানকে লেখে রেমান, আশরাফুজ্জামন চৌধুরীকে লেখে এসরাজ চোদুরি ইত্যাদি। তারা এত বড় নামের সাথে পরিচিত নয় বা এ ধরনের নাম বানাণ করে লিখতে গেলেও বিরক্ত হয়। তারা চায় ছোট একটা নাম। আমাদের প্রজন্মের জন্য এই ছোট নামগুলো আবার বিপদজনক। শফিউল্লা নিজেই তার ভোক্তভুগি।

শফিউল্লা প্রথম যেদিন এয়ারপোর্টে এসে সস্ত্রীক অবতরন করল তখন জামাত ভাই কাউকে পায়নি। অনেক সময় এমন হয়ে যায়। অনেক পেয়ারের লোক থাকা সত্বেও কেউ গিয়ে উপস্থিত হয়না। ভাবে, আমি না গেলেও অনেকেই আছে। এই ভেবে কেউ যায় না। অথবা কমিনিকেশন গেপ হতে পারে। এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন শেষে বাইরে এসে শফিউল্লা অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কোন জামাত ভাই বা সে ধরনের পোষাকে কাউকে দেখেনি। সে যখন হলের এ মাথা থেকে সে মাথা পায়চারি করছিল তখন একজন কালো মানুষ তাকে খেয়াল করল। সব কালো মানুষের ভেতর কালো থাকে না। কিছু কিছু সাদাও থাকে। লোকটা মনে করল নিশ্চয়ই কোন অসুবিধায় পড়েছে।

শফিউল্লা শেষ পর্যন্ত পকেটে হাত দিল। কোন্ কোন্ টেলিফোনে কাকে ফোন করবে। তার কাছে একটা নাম্বার ছিল তার দূর সম্পর্কের এক নানার। ছোট বেলায় দেখেছিল। মায়ের মামা। এদেশে আছে প্রায় তিরিশ বছর। পরিবার নিয়ে। প্রথমেই সেখানে ফোন করবে স্থির করে একটা ফোন বোথে গেল। কাল লোকটা তাকে অনুসরন করে পেছনে দাঁড়িয়ে রইল। শফিউল্লা ফোন নাম্বার হাতে নিয়ে ফোন করছে। ডায়াল করছে আর রেখে দিচ্ছে। প্রতিবারই একটা সিকি যাচ্ছে। আবার করছে। কালো লোকটা দেখল সে ভুল করছে। ২১২ হল ম্যানহাটনের নাম্বার। এখান থেকে করতে হলে আগে একটা ১ দিতে হবে। লোকটা এগিয়ে গেল। বলল, মাফ করবেন। আপনি যে নাম্বারে ফোন করছেন তার আগে একটা ১ যোগ করতে হবে।

তার কথায় শফিউল্লা কান দেয়নি। হয়ত বা কিছুই বুঝেনি। আবার ডায়াল করল, একটা সিকি চলে গেল, আবার রাখল, লোকটা আবার বলল, আগে ১ ডায়াল কর। শফিউল্লা আগের মতই আবার করল। আবার একটা সিকি চলে গেল। আবার যখন ডায়াল করতে যাবে, তখন লোকটা রেগে গিয়ে নিজেই ১ ডায়াল করে বলল, নাও ইউ ডায়াল মাদার ফাক! এখন তুমি ডায়াল কর চুদিরপু!

তখন শফিউল্লা ব্যাপারটা বুঝল। এবং লাইন পেয়ে গেল। কিন্তু একি! জসিমউদ্দিন নানার নাম্বার তো এটাই! এসব কি বলে! জেসি এন্ড ফেমিলি! ধুত্যুরি! খতরনক! বলে রেখে দিল। পরে আহাম্মদ আলীর কাছে এসে বলছিল আর একবার নানার নাম্বারটা পরিক্ষা করতে। পরিক্ষাও হয়েছিল, জসিমউদ্দিন নানাকে পাওয়া না গেলেও তার পরিবারের অন্য লোকদের সাথে কথা হয়েছিল। কিন্তু সে বাসায় যাবার ইচ্ছে হয়নি শফিউল্লার। তারা নাকি নাম বদল করে খৃষ্টানের মত হয়ে গেছে।

যাই হোক জামালের বাচ্চা বলল, বাবা ঘুমিয়ে গেছে।

শফিউল্লা আরও দুএকটা নাম্বার ডায়াল করে কেথায়ও কোন আশার আলো দেখতে পায়নি।

পরের দিন সকালে আহামদ আলীর কাছে গেল। আহমদ আলী নিজেও খোঁজ করল অনেক জায়গায়। সাদেক আলীর কাছেও ফোন করল। না, নেই। কোথায়ও নেই। এখন শফিউল্লা বুঝতে পারল মারুফার কত দাম। সে দিশেহারা হয়ে গেল। কি উপায়! খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়! সারাদিন খোঁজে করে সন্ধ্যার সময় গিয়ে উপস্থিত হল ঠিকানা পত্রিকার অফিসে। একটা বিজ্ঞাপন দিবে। 'মারুফা, ফিরে এস। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কিছু করবনা।'

বাহারের বাসায় ওরা চারজন গল্প করছিল। আনিস ঠিকানা পত্রিকায় বিজ্ঞাপনটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করল। বলল, গেল কোথায়?

লতা বলল, বোধ হয় কোথায়ও গিয়ে আটকা পরেছে, অথবা খুন হয়ে গেছে।

এতবড় দামড়ি আটকা পড়বে কেন! নিশ্চয়ই ভাগছে! বিন্দু বলল।

বাহার বলল, এখানে মারুফারা ফিরে আসে না।

-৩৮-

আমানের রাজনৈতিক আশ্রয়ের দরখাস্তের শুনানী আগামী মাসে। কাগজপত্র যা প্রয়োজন সবই জমা দেয়া হয়েছে। একজন নামকরা উকিলের মারফতে। এখানকার বাঙালীরা প্রায় সবাই এই উকিলের মক্কেল। তার যথেষ্ট নাম আছে। জনাব ওয়াকার। ম্যানহাটানে তার বিরাট অফিস। তিনি রাতকে দিন, দিনকে রাত করতে পারেন। তার মাধ্যমে অনেক মানুষ কাগজ পেয়ে গেছে। এদেশের নাগরিকও হয়ে গেছে। আবার অনেক আছে যারা সবকিছুই হারিয়েছে। আর কোন দরখাস্ত করার সুযোগই নেই। তাদের হয়ত অন্য পথ ধরতে হবে।

আমান যখন ভিজিট ভিসা নিয়ে স্বপ্নের নগরে নোঙ্গর করে তখন তার পরিচিত এমন কেউ ছিলনা। দুলাভাই একজনের ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, রমজানকে আমি পাঠিয়েছিলাম। যোগাযোগ করে দেখ কোন সাহায্য করতে পারে কিনা। সেই রমজানই বুদ্ধি দিয়েছিল একমাত্র ওয়াকারই এসব মামলার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু সব কাজই উকিল করতে পারেনা। কিছু কাজ আছে যা উকিলের বুদ্ধিতে আসেনা। তার প্রমান বাদল। তিন দিকে তিন রকমের চেষ্টা করেও তার কিছু হয়নি। তাই উকিলের উপর তার কোন আস্থা নেই। এখন নিজের চেষ্টা নিজে করে এবং অন্যকেও পরামর্শ দেয। তার পরামর্শে অনেকেই উপকার পেয়েছে।

বাদলকে ডাকা হয়েছে আমানকে কিছু উপরি বুদ্ধি দেবার জন্য। বাদল ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি মিথ্যা কথায় কেমন পারদর্শি?

বুক কাপে।

তাহলে হবেনা। সাহস সঞ্চয় করতে হবে, মিথ্যা কথা জোর গলায় বলতে হবে। এদেশের ইমিগ্রেশন অফিসারগুলো একদম গাধা। সত্যি কথা বললে অনেক সময় বিশ্বাস করতে চায়না। কখন কোন্ মিথ্যা কিভাবে কত জোরে বলতে হবে তার একটা ট্রেনিং দিতে হবে। এই ধর গত মাসে একজন সিলেটবাসীর দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। তাকে আমি বুদ্ধি দিয়েছিলাম। অবশ্য সে আমার চেয়ে কম বুদ্ধি রাখেনা। তিনি দরখাস্ত করেছিলেন কাদিয়ানি হিসেবে। তার কাজ দেখিয়েছে মটর মিকানিক। তাকে নিয়ে ঘন্টাখানেক ক্লাশ করলাম। যাবার আগে তার হাতে একটা ওয়ার্কশপ থেকে গাড়ীর ইঞ্জিনের ময়লা হাতে লাগিয়ে সিমেন্টের উপর হাত ঘষতে বললাম। হাতের চামড়া খস খসে হয়ে গেল। তারপর ইঞ্জিনের ময়লা-তেল তার হাতে এমনভাবে লেগে গেল দেখলে মনে হয় সেই এই কাজেই অভ্যস্ত। কাদিয়ানির উপর কি রকম অত্যাচার হচ্ছে তা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিলাম। ইন্টারভিউতে তাকে বেশি প্রশ্ন করেনি। অফিসার তার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, দৈনিক কত ঘন্টা কাজ কর?

ঠিক নাই। যখন কাজ থাকে তখন বার চৌদ্দ ঘন্টাও করি। তবে দশ ঘন্টা প্রতিদিন কাজ করি।

তোমার হাত এত ময়লা কেন?

হুজুর এগুলো তো লোহার গাদ। ধূইলে উঠেনা। আর বেশি চেষ্টাও করিনা। আবার তো ময়লা হবেই।

ঠিক আছে যাও। আমরা পরে জানাব।

এদেশে কাজের লোক প্রয়োজন। তারা শুধু মামলার সব নথিপত্র দেখেনা। দেখে এ লোকটা দিয়ে এদেশের কি কাজ হবে। দু সপ্তাহ পরে সে চিঠি পেয়ে গেল। তার দরখাস্ত মঞ্জুর।

সামাদ সাহেব তো এত বড় নেতা। এরশাদের একজন সহকারী। প্রাক্তন এমপি। তার প্রমান অনেক খবরের কাগজ, ভিডিও ফিল্ম, এরশাদের সাথে বহু ছবি, জননেতা হিসাবে তার বহু বক্তৃতার খবর এবং ছবি, ক্ষমতায় থাকাকালীন তার ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহারের প্রমান। তিনি এত সব প্রমান দাখিল করেছেন যে মনে মনে ভাবলেন তার দরখাস্ত তো কোনভাবেই আটকাবেনা। তিনি একজন উকিল। হাইকোর্টের কাগজপত্র সব দিলেন। তারপর নাকে তেল দিয়ে বসে আছেন। এখানে সেখানে যা পারেন কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত প্লাম্বিংএর কাজ ধরলেন। অনেক পয়সা। একটা কন্ট্রাক্ট নিলেই পাঁচ সাত হাজার এসে যায়। মাসে দুএকটা করলেই হয়। খুব আরামে দিন কাটাচ্ছেন। সব রকম সভাসমিতিতে তাকে দেখা যায়। কারন অঢেল সময় আছে তার হাতে। নাম প্রকাশের জন্যও তার তীব্র বাসনা। প্রায় সবখানেই তার নাম আছে। এসব হাসি খুশি নিয়ে দিন কাটছে। আর শুনানীর দিনের জন্য অপেক্ষা করছে।

অবশেষে দিন এল। তিনি খুব দামী সুট পরে একজন নেতার চেহারা নিয়ে কোর্টে উপস্থিত হলেন। তার উকিল হল ওয়াকার। ওয়াকারও অনেকটা নিশ্চয়তা দিয়েছেন। হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। কারন ইমিগ্রেশন যদি কোন সন্ত্রাসের গন্ধ পায় তাহলে যত শক্ত মামলাই হোক না কেন দেবেনা। তারা একবার সন্দেহ করে ফেললে সেটা আর দূর হয়না। হাজার প্রমান দিলেও। আরও একটা দিক আছে। যারা রাজনৈতিক নেতা তাদের কেস খুব কমই হয়েছে। কারন তারা এদেশে কোন কাজে লাগবেনা। এরকম ভুরি ভুরি উদাহরন আছে। যাদের পাবার কথা তারা পায়নি। যারা কথা বলতেও পারেনা তারা পেয়ে গেছে। তুমি যাই বলো, মিথ্যা কথাটা খুব জোর দিয়ে বলতে হবে। কথা বলার সময় মেউ মেউ করলে হবেনা। যা বলবে তাই বলবে। বার বার একই উত্তর দেবে। তাহলেই মামলা শক্ত হয়ে যাবে।

আমার কেস তো আওয়ামী লীগের কর্মি হিসাবে।

যে কর্মিই বলনা কেন, মিথ্যা কথা শক্ত করে জোর দিয়ে বলতে হবে। একই প্রশ্ন বার বার করবে। একই উত্তর দিতে হবে। যদি একবার একটু এদিক সেদিক হয়ে যায় তাহলে হবে না। দেশে কি কি কাজ করার কথা দরখাস্তে উল্লেখ করেছ, তোমার উপর কখন কি কি অত্যাচার হয়েছে, তারিখ গুলো মুখস্ত থাকতে হবে। কথা বলার সময় চোখ খোলা এবং মাথা সোজা রাখবে। মাথা নীচ করে কোন কথা বলবে না। তাহলে তারা মনে করে কোন কিছু লুকাচ্ছে। এসব কথা তোমাকে তোমার উকিল ওয়াকার বলে দিতে পারবেনা। কারন সে তো ভুক্তভোগি না। সে তো কোন ইন্টারভিউর মুখোমুখি হয়নি। তার শিক্ষা বইএর মাঝে সীমাবদ্ধ। সরেজমিনে অভিজ্ঞতা হল আমার। আমি এখন তিনটা নামে আছি এদেশে। কোনটা কখন কি কাজে লাগবে কে জানে। তোমার নাম, জন্মতারিখ নখদর্পনে থাকতে হবে। যে কোন প্রশ্নের উত্তর সোজাসোজি দিতে হবে। আমতা আমতা করলে সব শেষ।

তারপর একটা একটা করে সম্ভাব্য প্রশ্ন করল বাদল। আমান উত্তর দিচ্ছে। বাদল দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে কথা বলতে হবে। কোন প্রশ্নের উত্তর কি হবে। ঘন্টা দুয়েক লাগল প্রস্তুতিপর্ব শেষ করতে।

সব ব্যাপারেই প্রশিক্ষন প্রয়োজন।

- ৩৯ -

আজ ঈদ। বাহার আনিসকে নিয়ে নামাজ পড়তে গেল ব্রুকলীন মসজিদে। মসজিদের সামনে একজন একটা ছোট টেবিলে আতর সুরমা টুপি ইত্যাদি বিক্রি করছে। বাহার একটা আতর কিনে নিজে গায়ে লাগাল এবং আনিসকে দিল। বলল, বাঙালির তৈরি আতর ব্যবহার করে দেখ কেমন।

বাংলাদেশের তৈরি?

না, এখানেই তৈরি। মেড ইন আমেরিকা, কিন্তু বাঙালীর তৈরি। এর ছোট একটা কাহিনী আছে। কাহিনী শুরু করার আগে বাহার বলল, ঈদের আনন্দ এখানে কম হয় না। প্রতিটি মসজিদে ঈদের জামাত হয়। বাংলাদেশের মতই একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় প্রতিটি ঘরে। একে অপরের বাসায় যায়, আনন্দ ফুর্তি করে। ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে ছুটি এবং শাসনবিহিন দিন। হিন্দুরাও বাদ যায় না। ওরাও আসে বেড়াতে। প্রতিটি মসজিদে কয়েকটা জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদে সীমিত স্থান এক সাথে সংকুলান হয় না বলে দু তিনটা জামাত হয়।

শুধু ঈদের সময় তিনদিন ছুটি নেন সৈয়দ সাহেব। তখন লতাকে সময় দেন, বাসায় মেহমান ভর্তি থাকে। কোলাকুলি হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। কিন্তু অন্যের বাসায় বেড়াতে যাবার সময় নেই। কখন কোন্ মেহমান এসে ফেরত যাবে তাই এই তিন দিন ঘরেই থাকেন। লতাও যেতে পারেনা কোথায়ও।

এই আনন্দোৎসবে বাঙালি ভুলে যায় কোন দেশে কোথা ঈদ করছে। বাংলাদেশে যেমন ঈদ এবং তার আনন্দ উপভোগ করে এখানেও তাই হচ্ছে। নতুন কাপড়চোপড় পরে নামাজে আসে। যাদের টুপি নেই তারা সেদিনের জন্য একটা টুপি কিনে। এসব ইসলামি পোষাক এবং টুপি ইত্যাদির জন্য দোকান আছে। কোন কোন মুসল্লি চোখে ছুরমা দিয়ে, নাকে কানে আতর এস্তেমাল করেন। ছুরমা এবং আতর প্রতিটি মসজিদের সামনে পাওয়া যায়। প্রতিটি আতরের আলাদা আলাদ নাম আছে। এই আতরের উৎপাদক রানা নামে একজন বাংলাদেশি। আতর তৈরির কারখানা আছে তার। বাঙালি এবং আফ্রিকান মিলে তার দুই হাজারের উপর এজেন্ট আছে যারা তার তৈরি আতর বিক্রি করে। আমেরিকার অনেক রাজ্যে যেখানে মুসলমান বাস করে। নিউইয়র্কে যেখানে সেখানে রাস্তায় বসে তার আতর বিক্রি হচ্ছে।

রানার একটা ছোট কাহিনী আছে। এক দালালের মাধ্যমে মায়ামি বর্ডার দিয়ে সে প্রবেশ করে আমেরিকার মাটিতে। সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায়। কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে কোন কাজের সুবিধা করতে পারেনি। সে শুনেছে নিউইয়র্কে কাজের অনেক সুবিধা। কিন্তু সেখানে পৌছার যে ভাড়া তা তার কাছে নেই। সামান্য যা ছিল তা দিয়ে একটা ট্রাকের ড্রাইভারের সাথে রফা হয় নিউইয়র্ক পৌছে দেবার। ড্রাইভার বেইমানি করেনি। নিউইয়র্কেই তাকে পৌছে দেয়। তবে শহর থেকে বহুদূরে, আলবেনির কাছাকাছি একটা জায়গায়। সেখানে সে অনেক মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করেছে যারা নিউইয়র্ক শহরের দিকে আসছে।

কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তার পকেটে একটা পয়সা নেই। কিছু কিনে খাবে তা সম্ভব নয়। ভিক্ষা করবে, তাও বিবেকে বাধে। সে একটা ব্রিজের নীচে বসে পড়ল যে পথ দিয়ে নিউইয়র্ক শহরে যায়। কোন সময় রানা ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল একজরে ডাকে। একজন আফ্রিকান। জিজ্ঞেস করল, তুমি এত রাতে এখানে পড়ে আছ কেন?

বলা বাহুল্য, কোথায়ও কোন বিপদে পড়ে রাস্তায় কারও সাহায্য চাইলে খুব কম মানুষই এগিয়ে আসে। বিশেষ করে আমাদের এশিয়ান চামড়া দেখলে শ্বেতাংরা তো ফিরেও তাকাবে না। এই চামড়ার দিকে যারা তাকাবে তারা হল আফ্রিকান। অথবা এশিয়ান অন্য কোন দেশের মানুষ।

রানা বলল, আমার কাছে পয়সা নেই, আজ দুদিন প্রায় কিছু খাওয়া নেই। নিউইয়র্ক শহরে যাব, ভাড়া নেই। আমি বড় বিপদে পড়েছি।

উঠ, গাড়ীতে উঠ। আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি। আমার নাম যোসেফ।

গাড়ীতে বসে ভদ্রলোক রানার সব কাহিনী শুনে বলল, তোমার থাকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার বাসায় লিভিং রুমে থাকতে পার। এর মাঝে কাজ খোজে বের কর। আমার এক মুসলিম বন্ধু আছে। তার সাথে দেখা করে বল সে যদি কোন সাহায্য করতে পারে। তার নাম আহাম্মদ হালাবি। থাকে ব্রুকলীন হাইটসে।

অপরাধের দিকে থেকে হারলেমের পরই ব্রুকলীন হাইটস। এখানে অবশ্য মানুষের মাথা দিয়ে ফুটবল খেলার কথা শোনা যায়নি। তবে মাঝে মাঝে লাশ পড়ে থাকে। কয়েক মাইল এলাকা তাদের দখলে। প্রায় সবই কালো।

ঠিকানা নিয়ে রানা যখন হালাবির বাসায় পৌছে দরজার কড়া নাড়ল একজন ঘোমটা পড়া মহিলা দরজা খুলল। বলল, হালাবি এখন মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে। কখন আসে ঠিক নেই। তুমি বরং মসজিদে চলে যাও। সেখানেই তাকে পাবে। এখান থেকে সোজা গিয়ে প্রথম গলিতে ডানদিকে মোড় নিলেই দেখবে একটা বইর দোকান। এটাই মসজিদ।

কথামত রানা ঠিক বইর দোকান পেয়ে গেল। ইসলামিক বই পত্র এবং অন্যান্য জিনিষ ভর্তি এই দোকান। দোকানের মালিক একজন কালো লোক। তাকে জিজ্ঞেস করতেই হালাবির খবর দিল। বলল, এখন সে মসজিদের ভেতরেই আছে। বয়ান শুনছে।

রানা মসজিদের ভেতর ঢুকল। দেখে একজন ইংরেজিতে হাদিস ব্যাখ্যা করছে। পনর বিশ জন মুসুল্লি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। রানাও বসে পড়ল। এক ফাকে একজনকে জিজ্ঞেস করল, আহাম্মহালাবিকে আমার প্রয়োজন, তিনি কোন জন?

ঐতো বসে আছে।

তারপর তার কাছে গিয়ে বলল, যোসেফ আমাকে পাঠিয়েছে তোমার কাছে। আমার কিছু কথা আছে তোমার সাথে।

সাথে সাথেই সে বেরিয়ে এল।

আফ্রিকান মুসলমানরা বেশিরভাগই নীতিতে অটল থাকে। যা বলে তা করে। তাদের ভেতর যা বাইরেও তা। মুখোশ পরে না। হালাবি এসেছে সুদান থেকে। সুদানিরা খুব পরহেজগার। রানা মুসলমান শুনে তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেল। বলল, আগে তো চা পান কর। তারপর তোমার সব কথা শুনব। রানার সব কথা শুনে হালাবি বলল, আমি কাজ করি একটা গাড়ী ধোয়া মোছার দোকানে। এখানে অটোমেটিক মেশিনে গাড়ী ধোয়া হয়। ধোয়ার পরও কিছু ময়লা লেগে থাকে। কাপড় দিয়ে সেই

ময়লা পরিষ্কার করি। সহজ কাজ। তাই ঘন্টায় মাত্র তিন ডলার। কিছু টিপস পাওয়া যায়। তুমি যদি কর, তাহলে আমি মালিকের সাথে আলাপ করতে পারি।

দুদিন পরই হালাবি রানাকে কাজ দিল তার সাথে। তারপর বলল, তুমি যুবক। যখন কাজ থাকেনা তখন তুমি ইসলামিক বই, তসবিহ্, আতর ইত্যাদি বিক্রি করতে পার। ফোর্থ এভিনিউতে আর একটা মসজিদ আছে। সেখানে সপ্তাহে দু চার দিন বসতে পার। পয়সা না থাকলে এই আমাদের পরিচিত দোকান থেকে বাকীতে নিয়ে দিতে পারি।

সেই থেকে রানার ব্যবসা শুরু। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝে গেল তিন ডলারে কাজ করার চেয়ে বসে বসে আতর বিক্রি করা অনেক লাভজনক। কয়েক মাসের মধ্যে সে বেশ পয়সা করে ফেলল। এখন আর বাকিতে আনতে হয় না।

যোসেফের বাসায় এক সপ্তাহ ছিল রানা। তারপর মসজিদের কাছেই সস্তায় একটা রুমের ব্যবস্থা করে দেয় হালাবি। যোসেফের একটি সুশ্রী মেয়ে আছে। কালোর মাঝে যাকে বলে সুশ্রী। রানার কষ্টের কথা শুনে সে তার জন্য দু:খ অনুভব করেছে। সেই দেখে রানার একটা মায়া হয়ে গেছে তার জন্য। একদিন যোসেফের সাথে দেখা করে বলল, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। তোমরা যদি রাজি থাক। তবে লরা যদি রাজি থাকে তাহলে সে যদি মুসলিম হয়ে যায় তাহলে আমার জন্য ভাল। যোসেফের মেয়ের নাম লরা। লরা শুনে খুশিতে নেচে উঠল। সে মুসলমান হতে প্রস্তুত। একদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরই লরা এবং তার পিতার সাহায্যে তারা পাইকারি দামে আতর কিনতে লাগল। খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতে লাগল। এখন সে মিশর থেকে আমদানি করে। একটা বাড়ী নিয়ে তাতে ফেক্টরি করেছে। সেখানে ছোট ছোট শিশিতে পানির সাথে আতর মিশিয়ে লেবেল লাগানো হয়। এই কোম্পানীর নাম রানা এন্ড লরা কোম্পানী। এখন এর এজেন্ট সারা আমেরিকায় বলা যায়। রানা এখন মালটি-মিলিয়নিয়ার।

-৪০-

ঈদের কিছুদিন পরই ঘটনাটা ঘটল। সেদিনও আনিসই খবরটা পরিবেশন করল বাহারের বাসায়। ওজন পার্কের আল আমীন মসজিদের ঈমাম আলহাজ করিমউল্লা সাহেবকে পুলিশে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ধর্ষন। বার বছরের একটি ছেলেকে মসজিদের বেইসমেন্টে নিয়ে ধর্ষন করেছে। অভিযোগ করেছে ছেলের বাবা আলফাজ আলী। খবরটা ছাপা হয়েছে ঠিকানা পত্রিকায়।

শুনে বাহার বলল, তাহলে বদমাইসটা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল!

আপনি চিনেন নাকি? আনিস জিজ্ঞেস করল।

নামে এবং কামে চিনি। তার নামে অনেক কাহিনী আছে। কেউ ধরতে পারেনি। এবার বোধ হয় ফেসে যাবে।

খবরটা ছাপা হবার পর থেকে ঠিকানা অফিসে অনেকেই ফোন করতে লাগল। এসব খবর কেন ছাপেন আপনারা? জানেন এটা শত্রুতা বসে মামলা করেছে? ইত্যাদি অনেক ধরনের অভিযোগ আসছে। তার উল্টো ফোনও আসে। ঠিক করেছেন খবরটা ছেপে। বদমাইশটার শাস্তি হওয়া দরকার ছিল। আরও অনেক অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। ধরা যায়নি। এবার ধরা খেয়েছে। ভাল হয়েছে।

বরবাদির ভক্তরা এ নিয়ে বেশ হৈ চৈ করছে। তারা একটা দল তৈরী করেছে। মসজিদ কমিটির কিছু সদস্যকে হাতে নিয়ে একটা প্রতিবাদ করেছে। মসজিদে এখন দুটা দল। একদল বলছে, মামলা উঠিয়ে নিন। আর এক দল বলছে, অপরাধির শাস্তি হওয়া দরকার। জুম্মার নামাজের পর সেদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। এখন সহকারি ঈমাম মৌলানা এহসান ঈমামের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। তিনিও চান অপরাধির বিচার হোক। যদিও তার নিজের বিরুদ্ধে দুজন মহিলার অভিযোগ আছে। কিন্ত ঈমামতির পদটা তার চাই। করিমউল্লার জেল হয়ে গেলে পাকাপাকিভাবে সে পদটা পেয়ে যায়। অতএব লাগ ভেলকী লাগ। করিমুল্লা জেলে যাক।

এখানে করিমুল্লা এবং মসজিদ ব্যবসা নিয়ে কিছু না বললেই নয়। মসজিদ নিয়ে যে কি রকম ব্যবসা করা যায় এবং কত লাভজনক তা বিশ্বাস করা যায়না। করিমুল্লা আগে ছিল এস্টরিয়ায় গাউছিয়া মসজিদের ঈমাম। সেখানে অনেক গুতোগুতি। অনেক প্রতিযোগিতা। কাকে বাদ দিয়ে কে ঈমাম হবে। এক সময় ভোট হয়। সামান্য ভোটে করিমুল্লা ঈমাম নির্বাচিত হয়। সে মসজিদে আরও তিন জন মৌলানা ঈমামের পদের জন্য লাইনে আছে। এমন যখন প্রতিযোগিতা চলছিল তখনই এই আল আমীন মসজিদ তৈরি হয় ওজন পার্কে। মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান করিমুল্লার আত্নীয়। তিনিই করিমুল্লাকে নিয়ে আসেন। মসজিদ তৈরির ব্যাপারে এহসান অনেক খাটাখাটি করেছে। আশা ছিল সেই হবে এই মসজিদের ঈমাম। শেষ মুহূর্তে করিমুল্লা হয়ে গেল ঈমাম। সেই জ্বালা এখনও এহসান ভুলতে পারেনা। এটাই সুযোগ প্রতিশোধ নেবার। আল্লাহ যা করে সব ভালর জন্যই করে।

এহসান উঠে পড়ে লাগল কিভাবে এই সত্য ঘটনাকে প্রমান করানো যায়। সে নিজেও সাক্ষী দিতে প্রস্তুত। সে নিজেও দুএকবার দেখেছে ছেলেমেয়েদের বেইজমেন্টে নিয়ে যায়। ছুটির পর কেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে যায় তা এতদিনে পরিষ্কার হল।

করিমুল্লা গাউছিয়া মসজিদ থেকে চলে আসার পর তিনজন প্রার্থীর মাঝে একটা তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হল। কে হবেন ঈমাম? কমিটির বেশি সদস্য যে ভাগাতে পারবে সেই হবে ঈমাম। এই কমিটির চেয়াম্যান হলেন জনাব মহরম আলী। তিনি এখানে কয়েকটা সংগঠনের সাথে জড়িত। দ্বিতীয় শ্রেনীর নেতা। তার মামাতো বোনের দেবরের শালা একজন প্রার্থী। তিনি জোর করে এই প্রার্থীকে ঈমাম করার প্রস্তুতি নিলেন। বাংলাদেশি ষ্টাইলে তিনি ঘোষনা করে দিলেন যে জনাব মহিউদ্দিন হবে ঈমাম। এ নিয়ে সভা হল কয়েক দফা। এখানে বেশ সাহসের পরিচয় দিলেন কয়েক জন সদস্য। তাদের নিজেদের পেয়ারের প্রার্থীও আছে। অনেক তর্কবিতর্কের পর সাব্যস্থ হল ভোটে দেয়া হোক। নিরুপায় হয়ে মহরম আলী ভোটে গেল। তার নেতাগিরি কাজে লাগেনি। পাশ করে গেল কুব্বাস আলীর প্রার্থী। একজন নেতা হিসেবে মহরম আলীর একটা পজিশন আছে। একটা ইজ্জত আছে। এসব আওলা বাওলা মানুষের কাছে সে হেয় হয়ে গেল তা কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তিনি কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন।

নেতারা সবখানেই নেতাগিরি জাহির করতে চায়। তাদের স্বার্থে যখন সামান্য আঘাত লাগে তারা তা সহ্য করতে পারেনা। এখানে নেতাদের কারনেই প্রতিটি সংগঠন ভেঙ্গে দু'টা বা তিনটা হয়েছে। মসজিদ ভেঙ্গেও যে দুটা হতে পারে তার প্রমান এষ্টরিয়ার গাউছিয়া মসজিদের ঠিক উল্টোদিকে শাহজালাল মসজিদ।

মহরম আলী এক মাসের মধ্যে একটা ঘর ভাড়া করলেন। ঠিক গাউছিয়া মসজিদের উল্টোদিকে। তার সাথে তাল দেনেওয়ালা যথেষ্ট আছে। সবাই চাঁদা দিয়ে একটা ফান্ড তৈরি হল। ঠিক এক মাস পর থেকেই এই নতুন মসজিদে নামাজ পড়া শুরু হল। ঈমাম হলেন মৌলানা মহিউদ্দিন। মসজিদের নাম হল শাহজালাল মসজিদ।

এমনি ভাবে স্বার্থের খাতিরে এবং মসজিদ নিয়ে ব্যবসা করার মানসে এখানে সেখানে অনেক মসজিদ তৈরি হয়েছে। তাতে মসল্লির সংখ্যা বাড়েনি। এখন গাউছিয়া মসজিদের মুসল্লিরা ভাগ হয়ে কিছু যায় গাউছিয়ায় আর কিছু যায় শাহজালাল মসজিদে। মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে শুধু ঈমামের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

কেন এই ঈমামের সংখ্যা বাড়ানো? ব্যবসাটা কি?

এদেশে ধর্মীয় সংস্থাগুলোর ঈমাম বা পাদ্রীকে সরকারিভাবে প্রথম শ্রেনীর সরকারি অফিসারের মর্যাদা দেয়া হয়। এইসব ধর্মীয় সংস্থা থেকে যেসব চিঠিপত্র দেয়া হয় তা সরকারিভাবে সরাসরি গ্রহন করা হয়। কোন প্রশ্ন তোলা হয়না। ধর্মীয় ব্যাপার খুব স্পর্শকাতর। যদি কোন মসজিদের ঈমাম বা গীর্জার পাদ্রী চিঠি লিখে যে অমুক আজ থেকে দশ বছর আগে আমার এখানে আসা যাওয়া করত প্রার্থনা করার জন্য তাহলে এটা সব চেয়ে বড় প্রমান। আর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এধরনের চিঠি নিয়ে অনেকেই ইমিগ্রেশন সমস্যা সমাধা করেছে। বিশেষ করে ৮৮ সালের এমনেষ্টির অধিনে অনেকের দরখাস্ত বিনা বাক্যে মঞ্জুর হয়েছে।

একজন ঈমাম কয়েকজন সহকারিকে স্পন্সর করতে পারে। এটা ধর্মীয় ব্যাপার। যাকে স্পন্সর করবে তাকে বলা হবে ধর্মীয় কাজে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। অতএব তাকে ভিসা দেয়া হোক। কনি আইল্যান্ডের পাকিস্তানি মসজিদের ঈমাম এখন লাল ঘরে। তিনি গত চার বছরে এগার জনকে স্পন্সর করেছেন। এদের কেউ কোন মসজিদে বা ধর্মীয় কাজে যুক্ত নেই। নিউইয়র্ক টাইমস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি প্রতিটি স্পন্সরের জন্য আট হাজার আমেরিকান ডলার নিয়েছেন। এছাড়া স্থানীয় ভাবে অনেক চিঠি লিখেছে যার কোন সঠিক অঙ্ক পাওয়া যায়নি।

এই লাভজনক ব্যবসার জন্য বাঙালি মহলে এখন প্রতিযোগিতা চলছে। কে হবেন ঈমাম আর কার লোক আসবে অথবা কে কত টাকা দিয়ে আসবে। কোন কোন চিঠির জন্য কত টাকা দিতে হবে এসব এখন মসজিদ কমিটির মুখে মুখে। আফসোস যে একটা মসজিদে মাত্র একজনই ঈমাম হতে পারে। কয়েকজন ঈমাম হবার কোন ব্যবস্থা থাকলে তাদের খুব উপকার হত।

যাই হোক, আল-আমীন মসজিদের ঈমামতি এখন এহসান চালিয়ে নিচ্ছে। শতকরা ১০০ ভাগ আশা আছে করিমুল্লার শাস্তি হয়ে যাবে। একবার শাস্তি হয়ে গেলে সে আর ঈমাম হতে পারবেনা। অতএব এহসানের ঈমামতি আর কেড়ে নেয় কে!

আল্লাহ বান্দার দোয়া কবুল করেন।

ক্রমশঃ...